দ্বিতীয় ভাগ

ফিকাহ্ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ

মাওলানা সাঈদ আল–মিসবাহ

ভূমিকা

আল্লাহ পাকের ইবাদত ও আনুগত্যই হলো মুসলিম জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আর এই ইবাদত ও আনুগত্যের একমাত্র উপায় হলো কোরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (সিলসিলাতুল আহাদিস আস্‌সাহীহা, ৪ঃ ৩৬১, শব্দের সামান্য পার্থক্যে ইবনে মাজাহ্ ঃ৩১১০, আবু দাউদ (আল–মানাসেক)

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মৌলিক আকায়েদ (তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি) ও মৌলিক আহকাম (নামায, রোযা, ফরয হওয়া) ইত্যাদি যাবতীয় আলোচনা কোরআন ও হাদীসে সর্বসাধারণের বোধগম্য, সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে খুঁটিনাটি আহকাম ও বিধানগুলো বর্ণিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায়, যা চিন্তা ভাবনা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তদ্রূপ কালের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান কোরআন ও হাদীছে আলোচিত হয়নি। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সমাধান পেতে হলে কোরআন সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতিমালার আলোকে শরীয়ত নির্দেশিত পথে ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কোরআন–সুন্নাহ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সকল আহকাম ও বিধান আহরিত হয়েছে তারই নাম হলো الفقه বা ফিকাহ শাস্ত্র।

যেহেতু মেধা, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তা–পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণ সমপর্যায়ের ছিলেন না বরং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের মাঝে তারতম্য ছিলো। সেই সাথে তাদের মাঝে ইজতিহাদের প্রয়োগ ও পদ্ধতিগত পার্থক্যও বিদ্যমান ছিলো সেহেতু ফিকহী মাসায়েলের সমাধানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইজতিহাদে তাঁদের এই স্বাভাবিক মতান্তর কখনই সামান্যতম মনান্তরে পর্যবশিত হয়নি। বরং

তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। পরমত সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাহর উপর নিজেদের এবং উম্মতের আমল প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই ছিলো তাঁদের সকলের সমান উদ্দেশ্য।

তবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন ও হাদীসই যদি হয়ে থাকে ফিকাহ শাস্ত্রের অভিন্ন উৎস তাহলে মুজতাহিদ আলিমদের মতপার্থক্যের কারণ কি? কোরআন হাদীসের অভিন্ন উৎস থেকে অভিন্ন ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব নয়?

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুজতাহিদ ইমামদের কোন কোন মতামত বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীসেরও বিপরীত হয়ে যায়। এটা কেন? এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়ই বা কি?

এ প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয়। বিশেষতঃ ইসলামী জ্ঞান যাদের গভীর ও পরিপক্ক নয় এ প্রশ্ন যুগে যুগে তাদের বিব্রত করেছে। বিভ্রান্তও করেছে কম নয়। পাশ্চাত্যের সুযোগ–সন্ধানী অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এ প্রশ্নটাকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে বার বার। তবে আমাদের মহান পূর্বসুরী আলিমগণ এর সন্তোষজনক জবাব দিয়ে এসেছেন। এমন কি এ প্রসংগে মূল্যবান বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। ১

১। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লামা শা'রাণী রচিত আল–মীযানুল কুবরা কাশফুন নি'মাহ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রচিত রাফউল মালাম আ'নিল আইম্মাতিল আ'লাম। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) রচিত আল–ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ। ডক্টর মুস্তফা সাঈদ আল–খীন রচিত আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যাহ ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা, শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামাহ রচিত আসারুল হাদীস আল–শারীফ ফি ইখতিলাফিল আইম্মাহ। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) রচিত "ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ"। কাজী আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ আল–কুরতুবী রচিত "বিদায়াতুল মুজতাহিদ:। ডক্টর আবুল ফাতাহ রচিত দিরাসাত।

আলোচ্য প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়ার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ইমামদের ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ এ মতপার্থক্য নিন্দনীয় না প্রশংসনীয়? তৃতীয়তঃ এ মতপার্থক্য কি নব উদ্ভুত না ছাহাবা যুগ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে ধারাবাহিকভাবেই চলে এসেছে? চতুর্থতঃ ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইমামদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেমন ছিলো!

ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, কোরআন–হাদীসে বর্ণিত আকায়েদ ও আহকাম সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো সহজ–সরল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষেও একান্ত সহজসাধ্য। যেমন, তাওহীদ সম্পর্কে কোরআনের এরশাদ–

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।" (সূরা বাকারাহঃ ১৬৩)

আহকাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

'তোমরা ছালাত কায়েম কর। যাকাত আদায় কর।' (সুরা বাকারাঃ ৪৩)

শিক্ষা বিষয়ে হাদীসের এরশাদ হলো–

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ

"অনারবের উপর আরবের কোন শেষ্ঠত্ব নেই।'

তদ্রূপ কিছু আহকাম এমন বিপুল সূত্র পরম্পরায় সুপ্রমাণিত যে, তাতে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। বলাবাহুল্য যে, এধরনের ক্ষেত্রগুলোতে ইমাম ও মুজতাহিদদের মাঝে কোন মতভিন্নতা নেই। বরং ভিন্নমত প্রকাশকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডী থেকেই বহির্ভূত বলে গণ্য

হবে। পক্ষান্তরে শরীয়তের অমৌলিক কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো চিন্তা ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ, কিংবা খবরে ওয়াহিদ তথা একটি মাত্র সূত্রে প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য যে, এ দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। তদুপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা শুধু উত্তম অনুত্তমের মতপার্থক্য। অর্থাৎ, কোন বিষয়ের দু'টি দিকই জায়েয, তবে কোন দিকটি উত্তম সে সম্পর্কেই শুধু মতপার্থক্য। হালাল হারাম বা জায়েয না জায়েয ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতপার্থক্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

মোটকথা, শরীয়তের মৌলিক, দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়গুলোতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআ'তের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। দ্ব্যর্থবোধক ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ অমৌলিক কতিপয় বিষয়ের মাঝে তাঁদের মতপার্থক্য সীমিত ছিল এবং সেটাও ছিল উত্তম অনুত্তমের মতপার্থক্য। হালাল হারাম বা জায়েয না জায়েযের নয়।

ফকীহদের এ মতপার্থক্য কি নিন্দনীয় বা অকল্যাণকর?

অকাট্য যুক্তির আলোকে ওলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ফকীহদের আলোচ্য মতপার্থক্য হচ্ছে উম্মতের রহমত ও কল্যাণের উৎস। আল্লামা কুরতবী (রঃ) ও আল্লামা সুয়ূতি এ প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। اختلاف امتي رحمة 'আমার উম্মতের ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।

الجامع الصغير গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুনাভী (রঃ) হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ফকীহদের ইজতিহাদ ভিত্তিক ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য মূলতঃ উম্মতকে প্রশস্ততা দান করেছে। বিভিন্ন মাযহাব যেন বিভিন্ন রাজপথ ও মহাসড়ক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবগুলি সহকারে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে একমাত্র মুজতাহিদ ইমামদের সাথে হক ও সত্যের সম্পৃক্তির কারণে উম্মতের জন্য সংকট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি না হয়। শরীয়তকে উদার সহজ করার জন্যই মানুষকে সাধ্যাতীত কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মোটকথা, মাযহাবের ইখতিলাফ হচ্ছে উম্মতের জন্য এক বিরাট নেয়ামত, অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ

থেকে ছাহাবা ও তাঁদের উত্তরসুরীগণ ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলো অভিন্নমুখী বিভিন্ন জনপথতুল্য। আর এই ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, সুতরাং এভাবে তাঁর মু'জিযারই প্রকাশ ঘটেছে মাত্র। তবে আকায়েদ বিষয়ে ইজতিহাদের চেষ্টা নিঃসন্দেহে গোমরাহীরই নামান্তর। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথই হল অভ্রান্ত। আহকাম বিষয়ক ইখতিলাফের ক্ষেত্রেই শুধু আলোচ্য হাদীসের রহমতপ্রযোজ্য।১

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মন্তব্য দেখুন,

'আমার বক্তব্যের বিপক্ষে (শরীয়তের) কোন দলীল তোমাদের হাতে আসলে সেটাই তোমরা গ্রহণ করবে।'

১। ফয়যুল কাদীর ১ঃ ২০৯ পৃষ্ঠা।

এ প্রসংগে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে শরীয়তের যে সকল মূলনীতি ও বিধান নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো সকল নবীর অভিন্ন 'দ্বীন' সমতুল্য। তা লংঘনের অধিকার নেই কারো। এগুলো যে গ্রহণ করবে সে নির্ভেজাল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরাই হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত।

পক্ষান্তরে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন নবীর নিজস্ব 'বচন ও কর্ম' সমতুল্য যা শরীয়তভুক্ত রূপে স্বীকৃত। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন, 'যারা আমাকে পাওয়ার সাধনা করবে তাদের আমি অনেক পথের দিশা দিব।'১

১। মাজমুউ' ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১৯ঃ ১১৭

একটু পরে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) আরো বলেন,

'ওলামা, মাশায়েখ ও শাসকগণ তাদের মাযহাব, কর্মপন্থা ও শাসননীতি

প্রবর্তনের দ্বারা যদি প্রবৃত্তির পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি শুধু কামনা করে থাকেন এবং সাধ্যমত পূর্ণাংগ ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রতিপালকের মিল্লাত তথা কোরআন ও সুন্নাহ আকড়ে ধরার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সেটা হবে বিভিন্ন নবীর বিভিন্ন শরীয়ত ও কর্মপন্থার সমতুল্য। কাজেই প্রত্যেক নবী যেমন নিজস্ব শরীয়ত ও পন্থানুযায়ী এক আল্লাহর ইবাদত করার দ্বারা ছাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন, তদ্রূপ মুজতাহিদ ইমামগণও আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ সত্ত্বেও ছাওয়াবের অধিকারী হবেন।১

১। মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৯ খঃ, ১২৬ পৃষ্ঠা।

এবার দেখা যাক; মতপার্থক্য দ্বারা কি ধরনের কল্যাণ উম্মত লাভ করেছে।

প্রথমতঃ যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আপন মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ ওলামায়ে কেরাম ও মুফতীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকার ক্ষেত্রে এই সহজতা লাভ করা সম্ভব হতো না।

যেমন, হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহের জন্য নব্বই বছর অপেক্ষা করার শর্ত রয়েছে, যার ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

এই সংকটাবস্থা দূর করার জন্য হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রঃ) মালেকী মাযহাব মুতাবেক মাত্র চার বছর সময় সীমার ফতোয়া দিয়েছেন।১ লক্ষ্য করুন, মতপার্থক্যের পরিবর্তে সকল ইমামের ইজতিহাদ যদি নব্বই বছর সময়সীমার সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, তাহলে মুসলিম নারীদের কি পরিমাণ দুর্গতি হতো? কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাই বলেছেনঃ

'আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মতপার্থক্যের মাধ্যমে উম্মতের অশেষ কল্যাণ করেছেন। কেননা, যে কোন সাহাবীর আমল অনুসরণের সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি অবশ্যই প্রশস্ততা অনুভব করবে এবং ভাববে যে, তার চেয়ে উত্তমজন এ আমলটি করে গেছেন।২

১। বাংলা বেহেশতী জেওর ও আল-হীলাতুন-নাজেযাহ ৫০-৫১ পৃষ্ঠা।
২। জামেউ বায়ানিল ইল্‌মঃ ২, ৮০

খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) বলেছেন,

'আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মাঝে মতভিন্নতা না হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা, তাঁদের অভিন্ন মত হলে (শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে) মানুষ সংকীর্ণ অবস্থায় নিপতিত হতো। যেহেতু তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ইমাম, সেহেতু তাঁদের যে কোন একজনের মত অনুসরণের প্রশস্তা রয়েছে প্রত্যেকের জন্য।১

আল্লামা ইবনে কুদামাহ আল-আক্বায়েদে লিখেছেন

ইমামদের ইখতিলাফ রহমতস্বরূপ আর তাঁদের ঐক্যমত প্রমাণ স্বরূপ। অর্থাৎ, কোন বিষয়ে তাঁরা মতভিন্নতা পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে যে কোন একটি মত অনুসরণ করার। পক্ষান্তরে কোন বিষয়ে তাঁরা সর্বসম্মত হলে তার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই।

(দুই) শরীয়তে ইজতিহাদ ও চিন্তা-গবেষণার পথ খোলা থাকার বরকতেই ইসলামী ফিকাহ আজ এত প্রশস্ততা লাভ করেছে। আর ওলামায়ে কেরামও কোরআন ও হাদীসে ইজতিহাদ করার মাধ্যমে অশেষ ছাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ লাভ করেছেন।

(তিন) ইমামদের মতভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আমল তরকের ব্যাপারে উম্মত সংকিত ও সতর্ক হয়। অন্য দিকে চূড়ান্ত হতাশা থেকে উম্মত মুক্তি লাভ করে। যেমন, বিনা ওজরে নামায তরককারী সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে আহমদ ইবনে হাম্বাল, ইসহাক ইবনে রাহওয়ে ও ইবনে মুবারক প্রমুখ ইমাম কুফরির ফতোয়া দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাহাবা ও পরবর্তী ইমামদের মতে শরীয়তের কোন ফরযকে অস্বীকার না করে শুধু তরক করার কারণে মানুষ ফাসেক হয়, কাফের হয় না।২

এ মতভিন্নতার ফলে প্রথমোক্ত দলের অনুসারীদের মনে যেমন কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হয় (এ কারণেই বে-নামাযীকে কাফের বলা সত্ত্বেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো অথবা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন না করার কথা বলা হয়নি।) তেমনি দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীদের মনে শংকা ও সতর্কতা দেখা দেয়। কেননা, কোন বে-নামাযী যখন জানবে যে, কোন কোন ছাহাবী ও ইমামের ফতোয়া মতে সে কাফের বলে গণ্য তখন স্বভাবতঃই তার অন্তর কেঁপে উঠবে এবং সে তওবার মাধ্যমে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

১। জামেউ বায়ানিল ইল্মঃ ২, ৮০
২। ফাযায়েলে নামাযঃ ২৫ পৃষ্ঠা।

পক্ষান্তরে কোন একদিকে সকলের অভিন্ন মত হলে গোটা উম্মত হয়ত হতাশা কিংবা ঔদাসিন্যের শিকার হয়ে পড়তো।

(চার) মতভিন্নতা ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় ফতোয়া প্রদানের কারণ হয়। যেমন, মদখোর ও অন্যান্য কবীরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কবীরাহ গুনাহ হলেও শাফেয়ী ও মালেকী মতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ধরনের আরো বহু 'কল্যাণ ও রহমত'-এর কারণেই ইমামদের মতভিন্নতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং তা নিরসনের চিন্তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, মুসলিম জাহানের প্রথম মুজাদ্দিদ খলিফা উমার বিন আব্দুল আযীযকে অনুরোধ করা হল, ফকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন পথে ও অভিন্ন মতে একত্র করুন। জবাবে তিনি বললেন, ما يسرني انهم لم يختلفوا 'তাদের মতভিন্নতা না থাকাটা খুশির কারণ নয়।

শুধু তাই নয় বরং সকল প্রদেশে তিনি এই মর্মে ফরমান পাঠিয়ে দিলেন যে, স্থানীয় ফকীহ ও মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিলে তথাকার অধিবাসীরা সে আলোকেই আমল করবে।১

তদ্রূপ ইমাম মালেক (রঃ)কে খলীফা আল মনসুর একবার জানালেন, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আপনার সংকলিত মুআত্তার অনুলিপি সকল

প্রদেশে এই ফরমানসহ পাঠিয়ে দেব যে, এখন থেকে সকলকে এই কিতাব মতেই আমল করতে হবে।

১। সুনানে দারামী ১ খঃ, ১৫১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) খলীফাকে নিষেধ করে বললেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হাদীসের উপর মানুষের আমল শুরু হয়েছে। সুতরাং সকলকে নিজ নিজ পছন্দ করা মত ও রিওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করতে দিন।

আমীরুল মু'মিনীন বা মুসলিম উম্মাহর শাসক হিসাবে খলিফার আপাত সুন্দর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কি দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণ করে না যে, ইমামদের অভিন্ন মতের পরিবর্তে তাদের মতভিন্নতার মাঝেই রয়েছে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের স্বার্থে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) সাত তিলাওয়াতের পরিবর্তে একটি মাত্র তিলাওয়াত অনুযায়ী কোরআনের অনুলিপি তৈরী করে সকলের জন্য তা বাধ্যতামূলক করে অন্য সকল অনুলিপি পুড়ে ফেলেছিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণও তাতে সর্বসম্মত সমর্থন দিয়েছিলেন। এখন কথা হলো, ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অভিন্ন মত অনুসরণই যদি উম্মতের জন্য কল্যাণকর হত তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীন ফিকাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁরা তা করেননি; উপরন্তু পরবর্তী যুগে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ও ইমাম মালেক এ ধরনের চিন্তা পরিষ্কার ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

একটি সংশয়ের নিরসন

অনেকে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত সমূহের ভিত্তিতে ফকীহদের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতাকে নিন্দনীয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"আর তারা ইখতিলাফ করতেই থাকবে তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়)। (আর আপনি তাদের এ ইখতিলাফের কারণে বিচলিত হবেন না! কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত পূর্ণ হবেই যে, আমি জিন ও ইনসান উভয়কে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করব।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ۔

"আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। আর মতানৈক্য করো না।"১

আরো ইরশাদ হয়েছে

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পরস্পর ইখতিলাফ করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি পৌঁছার পর, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।২

এর জবাবে আল্লামা কুরতুবী বলেন

১। আলে ইম্রানঃ ১০৩
২। আলে ইম্রানঃ ১০৫

আলোচ্য আয়াতে শরীয়তের অমৌলিক বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কেননা, মূলতঃ তা ইখতিলাফ নয়। (নিন্দনীয়) ইখতিলাফ তো হলো, যা একতা ও সম্প্রীতি অসম্ভব করে তোলে। মাসায়েল সংক্রান্ত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, সেটা শরীয়তের বিভিন্ন বিধান ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাবাহুল্য যে, এধরনের মতপার্থক্য ছাহাবাযুগেও ছিল। উদ্ভূত সমস্যার

সমাধান করতে গিয়ে সাহাবাগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় ছিলো পূর্ণ মাত্রায়।১

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ইখতিলাফ দু' প্রকারঃ হারাম ও জায়েয। কোরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত কোন বিষয়ে ইখতিলাফ করা হারাম। পক্ষান্তরে চিন্তা ও উদ্ভাবনসাপেক্ষ বিষয়ে ইখতিলাফ শুধু বৈধই নয় স্বাভাবিকও বটে। আর এই প্রথমোক্ত ইখতিলাফকেই কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি কোরআনের আয়াতগুলো পেশ করে বলেন,

'ফকীহদের মতপার্থক্যপূর্ণ প্রায় সব বিষয়ই এমন, যার স্বপক্ষে কোরআন–সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন দলিল আমি পেয়েছি"।২

আল্লামা ইবনে কুদামাহকৃত আল্ মুগনীর ভূমিকায় মুহাম্মদ রাশীদ রেযা ইখতিলাফের বিপক্ষীয় প্রমাণাদি উল্লেখপূর্বক লিখেছেনঃ

১। কুরতুবী ৪ খঃ, ১৬৯ পৃঃ।
২। ইমাম শাফেয়ী রচিত আর রিসালাহ

'বোধ, বুদ্ধি ও মতামতের বিভিন্নতা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়।' আল্লাহ বলেন, 'আর এরা ইখতিলাফ করতেই থাকবে, তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়। তাদের ইখতিলাফের কারণে আপনি বিচলিত হবেন না। কেননা,) তিনি এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন।"

তাই ইসলাম (ইখতিলাফ মাত্রেরই নিন্দা না করে) শুধু বিভেদাত্মক ইখতিলাফের নিন্দা করেছে।

এই নীতি অনুসরণ করেই আমাদের পূর্বসূরী আকাবিরগণও মৌলবিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত প্রয়োগ করেননি; বরং সর্বসম্মতভাবে কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বাণী অবিচলভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সাধারণ আমল ও মুআমালাতের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা ইজতিহাদ–ইস্তিম্বাতের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর বাণী ছিল প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক।

বলাবাহুল্য যে, এই ইজতিহাদ ভিত্তিক মতভিন্নতার কারণে পরস্পরকে তাঁরা অভিযুক্ত করেননি। কেননা, যে বিষয়গুলোকে শরীয়ত প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক রেখেছে সেগুলোতে ইজতিহাদ প্রয়োগ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিলো আল্লাহর নির্দেশ। সে নির্দেশই সকলে পালন করেছেন পূর্ণআন্তরিকতারসাথে।১

১। ফাওয়ায়েদু কিতাবিল মুগনী ওয়াশ্ শারহিল কাবীর (১২ পৃষ্ঠা)

এবং কোরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াসই ছিলো তাদের ইজতিহাদের বুনিয়াদ। বলাবাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ইজতিহাদের ফলাফল এসেছে বিভিন্ন। কিন্তু এই মতপার্থক্য তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতম ব্যত্যয়ও ঘটাতে পারেনি। বরং ইখলাস ও উদারতার অবস্থা তো ছিলো এই যে, অন্যের যুক্তি হৃদয়ংগম হওয়া মাত্র প্রসন্নচিত্তে তা মেনে নিয়েছেন। এমন কি শিক্ষক হয়েও ছাত্রের যুক্তি ও মতামত মেনে নিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না তাদের।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কতিপয় দৃষ্টান্তঃ

আমাদের বক্তব্যকে অধিকতর হৃদয়ংগম করানোর জন্য ফকীহদের পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) একবার ইমাম আবু হানীফার কবরের নিকট ফজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মতে ফজরে দোয়া 'কুনূত' পড়া আবশ্যক হলেও সেদিন তিনি এই বলে কুনূত পড়া বাদ দিলেন যে, এই কবরবাসী (ইমাম) আবু হানিফা ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তার আদব রক্ষা করতে চাই। অনেকের মতে সেদিন তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, আবু হানীফা (রঃ) অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।১

ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)কে শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন–

"ফিক্বাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব

তাকে বরণ করতেই হবে। কেননা, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের তাওফীক (ঐশী দান)প্রাপ্তদেরঅন্যতম।২

১। আওজাযুল মাসালেক ১ঃ ১০৩। ২। আওজাযুল মাসালেক ১ঃ ৮৮।

এমন কি ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের প্রতিও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। দেখুন–

'কেউ ফিকাহ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। কেননা, কোরআন–সুন্নাহর মর্ম তাদের সহজ–আয়ত্তে এসেছিল। আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ বিন হাসানের গ্রন্থসমগ্রের কল্যাণেই শুধু আমি ফকীহ হতে পেরেছি।১

১। দুররুল মুখতার–১ঃ ৩৫। রদ্দুল মুহতার– ১ঃ ৩৫।

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতপার্থক্যের কথা সর্বজনবিদিত, যার ফলে দুটি আলাদা মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন সুমধুর ছিলো আলোচ্য ঘটনা ও মন্তব্য তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয়।

এছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন। অনেকে ইমাম সাহেবের জীবনচরিতও রচনা করেছেন।১ তাছাড়া বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ অন্য মাযহাবের টীকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেছেন; যা প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ আলাদা পথের পথিক নন। উৎস তাদের এক এবং লক্ষ্যও তাদের অভিন্ন। যেন তারা একই মায়ের অনেক সন্তান; শারীরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই মাতৃগর্ভে যাদের জন্ম এবং একই মাতৃকোলে যারা প্রতিপালিত এবং একই নাড়ীর বন্ধনে যারা আবদ্ধ।

১। শাফেয়ী মাযহাবের মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার মূল্যবান জীবনচরিত রচনা করেছেন– عقود الجمان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان নামে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আমাকে বলেছিলেন, যেহেতু হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে আপনারা শ্রেষ্ঠ সেহেতু আমার অজানা কোন হাদীস আপনার সংগ্রহে থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সে জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর বসরা বা সিরিয়া সফর করতেও আমি তৈরী আছি।[১]

অন্য মাযহাবের ইমামের সামনে একজন বরেণ্য ইমামের এমন অতুলনীয় বিনয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাদের ইখলাছ, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর প্রতি ইমাম আহমদের (রঃ) সশ্রদ্ধ অনুভূতিও লক্ষ্য করুন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْعَثُ فِي رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ رَجُلًا يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ

'প্রত্যেক শতাব্দির মাথায় আল্লাহ এমন এক ব্যক্তি পাঠান যিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদান করেন।'

এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয। আর দ্বিতীয় শতাব্দিতে হলেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জন্য আমি দোয়া ও ইস্তিগফার করছি।[২]

১। আদাবুশ–শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু ৯৫ পৃষ্টা, শব্দের সামান্য ব্যবধানে ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ২খঃ, ১৫৪ পৃঃ এবং ১খঃ, ৪৭৬ পৃঃ। হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯খঃ, ১০৬ পৃঃ।

২। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৬০ পৃষ্ঠা।

পুত্র আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন,

প্রিয় পুত্র! পৃথিবীর জন্য ইমাম শাফেয়ী হলেন সূর্যতুল্য এবং মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য।[১] ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে তাঁর আরো দুটি মন্তব্য দেখুন–

'ফিকাহ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।"[২]

ইলমের আলোচনায় তার চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই। তদ্রূপ সুন্নাতে রাসূল আনুসরণেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।[৩]

১। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৬০–৬১ পৃষ্ঠা।

২। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৬১ পৃষ্ঠা। ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ২খঃ ২৫৮ পৃঃ।

৩। ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ২খঃ, ২৫৮ পৃঃ। ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৬১ পৃষ্ঠা।

এছাড়া আবু উসমানের প্রতি ইমাম আহমদের ভালবাসার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তিনি ইমাম শাফেয়ীর পুত্র ছিলেন।[১]

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক সম্পর্কে আবু মানসুর আল–বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেকের (রঃ)

১। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইবনে আবি হাতেম রাযী রচিত আদাবুশ–শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী এবং হিল্‌ইয়াতুল আওলিয়ার ইমাম শাফেয়ী অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম মালেকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খিদমতে ছিলেন।

ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেকের কোন উদ্ধৃতি এ ভাবে দিতেন, আমাদের উস্তাদ মালিক বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলতেন,

'ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম মালেক (রঃ) সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই। হাদীছের সনদ আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালেকের অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য।

ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (রঃ) না হলে হিজাযের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত। (ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৪৯ পৃষ্ঠা।)

অন্যদিকে ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ীকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন? খতীবে বাগদাদী রচিত তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে ইমাম মালেকের মন্তব্য শুনুন–

শাফেয়ীর চেয়ে মেধাবী কোন কোরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি। (ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, ৫৮ পৃষ্ঠা।)

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর শ্রদ্ধাবোধঃ

এক মজলিসে এক হাদীস শুনে ভাবাতিশয্যে ইমাম শাফেয়ী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ফলে তার মৃত্যুর ভুল সংবাদ বলাবলি শুরু হল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী তা শুনে বললেন, সত্যি তার মৃত্যু হয়ে থাকলে যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা হারালাম।

ফেকাহ ও ফতোয়া সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ইমাম শাফেয়ীকে দেখিয়ে বলতেন, একেঁ জিজ্ঞাসা করো(মানাকিবুশ–শাফেয়ী, ৫৮–৫৯)

ইমাম আবু হানীফার দরবার থেকে কেউ আসলে বলতেন, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ফকীহ' এর কাছ থেকে এসেছো।

এক সাথে হজ্ব পালনকালে সুফিয়ান সাওরী ইমাম আবু হানীফার পিছনে চলতেন। আর কোন মাসআলা পেশ হলে তিনি নিরব থাকতেন। ইমাম সাহেবই জবাব দিতেন। (আওজাযুল মাসালেক।) ইমাম সুফিয়ান সাওরী স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, আবু হানীফার সাথে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্যও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন; তাঁদের প্রতি কি অতুলনীয় ভক্তি–শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করতেন।

এতক্ষণ ফকীহদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে আলোচনা হল। আসুন এবার দেখি, একের ইজতিহাদ ও মতামত সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন কি ছিল।

পারস্পরিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাঃ

প্রথম দৃষ্টান্তঃ আল ইশ্‌বাহ আন আখিরিল মুসাফফা গ্রন্থে ইমাম নাসাফী (রঃ) লিখেছেনঃ

আমাদের ও অন্যান্য ইমামের ফিকহী মাযহাবের (বিশুদ্ধতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলব, আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নির্দ্বিধায় বলব যে, আমাদের আকীদাই হক এবং প্রতিপক্ষের আকীদা না হক। অর্থাৎ, ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবী করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রমাণ সেখানে প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা অদৃঢ়মূল। পক্ষান্তরে আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ়মূল। সুতরাং ভিন্নমতের কোনই অবকাশ নেই।

(দুররুল মুখতার ১খঃ, ৩৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের (রঃ) মতে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করালে অযু ভেংগে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভাংগে না তাদের পিছনে কি আপনি নামায পড়বেন। জবাবে তিনি বললেন, কেন নয়। ইমাম মালেক ও ইমাম সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবের পিছনে কেন নামায পড়ব না? (তাঁদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভংগ হয় না)

এ ঘটনাটিতে দু'টি বিষয় ফুটে উঠেছে (এক) কোন মাযহাবই ভ্রান্ত নয়। কেননা, সকল মুজতাহিদের মাযহাব ও ইজতিহাদের মূল উৎস হচ্ছে কোরআন, সুন্নাহ ও সেই ভিত্তিক কিয়াস। (দুই) পরস্পরের মতামত ও ইজতিহাদের প্রতি ইমামদের শ্রদ্ধাবোধ ছিলো পুরো মাত্রায় এবং প্রত্যেকেই অপরকে হকের অনুসারী মনে করতেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) একবার হাম্মাম খানায় গোসল করে ইমামতি করলেন। নামাযের অনেক পরে জানা গেল যে, হাম্মাম খানার কুয়ায় মরা ইঁদুর পড়ে আছে। হানাফী মাযহাব মতে পানি নাপাক বিধায় নামায দোহরানো দরকার; কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না। তখন তিনি বললেনঃ

এ সংকট মুহূর্তে আমরা আমাদের মদনী ভাইদের (মদীনাবাসী ইমামদের) এই মত অনুসরণ করব যে, দু'মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা নাপাক হয় না। (আল ইনসাফ ৭১, দিরাসাত ফিল ইখতিলাফ থেকে সংগৃহীত ১১৭ পৃষ্ঠা)

দেখুন, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) মদীনার ইমাম মালেক ও তাঁর অনুসারীদের ভাই বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা উভয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছি এবং নিজ নিজ চিন্তা মোতাবেক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমরা সকলেই হকের উপর আছি। যেহেতু আমাদের উভয়ের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ সেহেতু আমরা একই মায়ের দুটি সন্তান তুল্য। আরো লক্ষণীয় যে, একাধিক মাযহাবের উপস্থিতি সংকটকালে শরীয়তের উপর আমল করার ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা ও সহজতা এনে দেয় আলোচ্য ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন,

'মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমার মতের বিপরীত আমল করতে দেখলে তাকে বাঁধা দিও না।' (হাফিজ আবু নু'আয়ম রচিত হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬খঃ, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।)

তিনি আরো বলেন,

'ফকীহদের মতভেদ রয়েছে এমন ক্ষেত্রে কোন ভাইকে আমি যে কোন মত গ্রহণে বাঁধা দেই না। (আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২খঃ, ৬৯ পৃঃ)

আলোচ্য দুটি মন্তব্য থেকে ইমাম সুফীয়ান সাওরীর এই কর্মনীতিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অপর মুজতাহিদের মতামতকে তিনি না হক মনে করতেন না। কেননা, এটা ইজতিহাদের ফল। আর ইজতিহাদ হচ্ছে শরীয়তেরই নির্দেশ। তদুপরি তাঁর 'ভাই' শব্দটি আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়

পঞ্চম দৃষ্টান্তঃ হাদীসের ইরশাদ হল,

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

'তোমাদের কেহ কোন 'অন্যায়' দেখলে হাতে (শক্তি দ্বারা) বাঁধা দিবে। তা না পারলে মুখে (কথা দ্বারা) বাঁধা দিবে, তাও না পারলে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিম (৪৯), আবু দাউদ (১১৪০), তিরমিযি (২১৭৩), নাসাঈ (৮ঃ ১১১), ইবনে মাজাহ (৪০১৩))

হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম নববী (রঃ) বলেন, এমন ক্ষেত্রেই শুধু প্রতিবাদ করা যাবে যার অন্যায় হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাঁধাদান করা বৈধ নয়।

ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাযযালী অন্যায় কর্মে বাঁধাদান প্রসংগে লিখেছেনঃ

'যে সকল অন্যায় তল্লাশি ছাড়া প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তার অন্যায় হওয়া ইজতিহাদনির্ভর নয় বরং স্বতঃসিদ্ধ, সেগুলোতেই শুধু বাঁধাদান করা হবে। অতঃপর তিনি ইজতিহাদনির্ভর না হওয়ার শর্ত সম্পর্কে লিখেছেনঃ

এ শর্ত এ জন্য যে, কোন বিষয়ের অন্যায়ত্ব ইজতিহাদনির্ভর হলে (যেহেতু তা সুনিশ্চিত নয় সেহেতু) তাতে বাঁধাদানের অধিকার নেই। সুতরাং গুই সাপ, হায়েনা এবং বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কোন শাফেয়ীকে বাঁধা দেয়ার অধিকার কোন হানাফীর নেই। কেননা, হানাফী মাযহাবে জায়েয না হলেও তাঁদের মাযহাবে তা জায়েয। তদ্রূপ নেশা উদ্রেক করে না এরূপ নবীয (খেজুরের বা আংগুরের রস) পান করার ব্যাপারে কোন হানাফীকে বাঁধা দেয়ার অধিকার কোন শাফেয়ীর নেই। ইত্যাদি। (ইহইয়ায়ে উলুমদ্দীন ২ঃ ৩৫৩।)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী ফকীহদের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও পরমত সহিষ্ণুতা ছিল পূর্ণ অটুট। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) লিখেছেন—

'সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তীদের অমৌল বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য ছিল। যেমন নামাযে সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়া, কিংবা উচ্চস্বরে বা অনুচ্চস্বরে পড়া। তদ্রূপ ফজরে কুনূত পড়া না পড়া। রক্তমোক্ষণ বা নাকে রক্তক্ষরণ ও বমনকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করা না

করা, ইত্যাদি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা একে অপরের পিছনে 'ইকতিদা' করতেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও অন্যান্যরা ইমাম মালেকসহ মদনী ইমামদের পিছনে ইক্তিদা করতেন। অথচ তাঁরা উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে কোনভাবেই বিসমিল্লাহ পড়তেন না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১খঃ, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, আল–ইন্সাফ।)

ফিকহী মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়

ফিকাহ'র বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদগত কারণে মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়, বরং নববী যুগে স্বয়ং ছাহাবা কেরামের মাঝেও তা বিদ্যমান ছিল। তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির বরকতে এ মতপার্থক্যের নিরসন তাঁদের জন্য ছিল অতি সহজ। তাঁরা যখনই কোন সমস্যা বা মতপার্থক্যের সম্মুখীন হতেন, সাথে সাথে দরবারে রিসালতে তা পেশ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হতেন না। বরং মীমাংসা করে দিতেন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উভয়ের মতামতকেই অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন, সহী বুখারীতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আহযাবের (খন্দক যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, তোমাদের কেউ যেন বনী কুরায়যা পৌঁছার পূর্বে নামায আদায় না করে। পথে আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে একদল সাহাবা বললেন, এমন কি সময় পার হয়ে গেলেও বনী কুরায়যায় পৌঁছার পূর্বে আমরা নামায পড়বো না। অন্যরা বললেন, আমরা পথেই সময়মত নামায পড়ব। কেননা, নামায কাযা করানো আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের গতি দ্রুত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাতে আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছা যায়। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দলকেই তিরস্কার করেননি।

এখানে দুটি বিষয় বোঝা গেল। প্রথমতঃ আয়াত বা হাদীসের সাধারণ অর্থের উপর আমল করা যেমন দোষনীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদ প্রয়োগ করে বিশেষ অর্থ আহরণ করাও নিন্দনীয় নয়। (বুখারী, হাদীস নং ৪১১৯।)

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের অমৌল বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য। কোনটাকেই না হক বলা যাবে না। (ফাতহুল বারী ৪০৯ পৃঃ ৭ম খণ্ড, দারুল মা'রিফ বইরুত কর্তৃক প্রকাশিত।) তবে মতান্তর থেকে

মনান্তর বা পরস্পরের নিন্দাবাদকে আল্লাহর রাসূল ভাল চোখে দেখেননি। তিরস্কার করেছেন। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আলিমের শরণাপন্ন না হয়ে ইজতিহাদ করাকেও তিনি পছন্দ করেননি। যেমন, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমাদের এক সাথীর মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফরয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয আছে কি না জানতে চাইলেন। সাথীরা না বাচক উত্তর দিলে বাধ্য হয়ে তিনি গোসল করলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হল। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কঠিন তিরস্কার করে বললেন–

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ـ

'তাকে তারা খুন করেছে। আল্লাহ তাদের খুন করুন। জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হল অজ্ঞতার দাওয়াই।

আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, যাদের যোগ্যতা নেই তাদের ইজতিহাদ করার অধিকার নেই, বরং যোগ্য আলিমের কথা মেনে চলাই তাদের কর্তব্য।

মোটকথা, ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদী মতপার্থক্য নববী যুগেও ছিল। পরবর্তীতে সাহাবা যুগেও ছিল। বরং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মতপার্থক্য সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল। যেমন, নামায তরককারীর কাফের হওয়া না হওয়া; গোসলে মেয়েদের মাথার খোপা খোলা না খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে তার ইদ্দতের মেয়াদ কতটুকু? ইত্যাদি বিষয়গুলো সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল।

তবে আগেও বলে এসেছি যে, সাহাবা ও ফকীহদের যাবতীয় ইজতিহাদের উৎস ছিল অভিন্ন। একই উৎস থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁরা মাসায়েল ইস্তিম্বাত করেছেন। ফকীহ ও মুজতাহিদদের ইজতিহাদের উৎস কি কি? এবার সে সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করবো।

ফিকাহ শাস্ত্রের উৎস

ফিকাহ শাস্ত্রের যাবতীয় মাসায়েল আহরণের উৎস মোট চারটি। যথা, কোরআন, হাদীস, ইজমা ও 'কিয়াস'। প্রথম উৎস হল কালামুল্লাহ এবং দ্বিতীয় উৎস হল সুন্নাতে রাসূল। সুতরাং কোরআনে বা সুন্নায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কোন হুকুম পাওয়ার পর পরবর্তী কোন দলীল বা যুক্তির অবতারণার কোন অবকাশ নেই। সেটাই মেনে নিতে হবে অম্লান বদনে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় ফায়সালা করার পর মুমিন নর-নারীর কোন অধিকার থাকে না। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় তারা পরিষ্কার ভ্রান্তিতে আছে।' (আল-আহযাব-৩৬)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (আল-ইমরান-১৩২)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে তাদের কাফের আখ্যায়িত করে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাদের ভয় থাকা উচিত যে, (দুনিয়াতেই) হয়ত তারা কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হবে কিংবা (আখেরাতে

অবধারিতভাবে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের ঘিরে ধরবে। (সূরায়ে নূর-৬৩)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

'আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না। (সূরা আল-ইমরান, ৩২)

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

'আর এরা দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এরা মোটেই (প্রকৃত) মুমিন নয়। আর এদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পানে আহবান করা হয়, যেন তিনি তাদের বিবাদ মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরায়ে নূর, ৪৭)

কয়েক আয়াত পরেই মুমিনদের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে-

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পানে আহবান করা হবে, যেন তাদের মাঝে তিনি ফয়সালা করে দেন, তখন মুমিনদের কথা তো হবে এই যে, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। এরাই হল সফলকাম। (সূরায়ে নূর, ৫৪)

আরো বিভিন্ন স্থানে আরো পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ জারি করেছেন, যাতে মুর্খরা হাদীসে রাসূল উপেক্ষার পায়তারা করার কোন সুযোগ না পায়। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন।’ (আলে ইমরান, ৩১)

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔

‘রাসূল তোমাদের যা কিছু দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর। (সূরায়ে হাশর, ৭) (এখানে ‘যা কিছু’ যেহেতু অনির্ণীত, কাজেই শরীয়তের যাবতীয় আহকামও তার অন্তর্ভুক্ত হবে।)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

‘যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।’ (সূরায়ে নিসা, ৮০)

কেননা তাঁর জীবনের সকল কথা, কাজ ও ‘অনুমোদন’ তথা হাদীসে রাসূল হচ্ছে আহকামে এলাহী বা কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

এছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম–আহকাম ও ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন এবং তা শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

‘বস্তুতঃ আল্লাহ পাক মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের মাঝে তাদেরই (মানব জাতিরই) মধ্য হতে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান এবং তাদের সংশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও ‘হিকমত’ (জ্ঞানের বাণী) শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।’[১]

১। উম্মতের সামনে কোরআনের ব্যাখ্যা তুলে ধরাও তাঁর রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون

‘আর আমরা নাযিল করেছি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন যেন মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় তাদের জন্য আপনি ব্যাখ্যা করে দেন। যাতে তারা চিন্তা ফিকির করে। (সূরা আন্‌নাহ্‌ল, ৪৪)

আরও এরশাদ হয়েছে–

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم اللذي اختلفوا فيه وهدي ورحمة لقوم يؤمنون

‘আর আমরা আপনার উপর কিতাব এ জন্যই নাযিল করেছি যে, যে সব বিষয়ে তারা বাদানুবাদ করেছে তা আপনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে (বুঝিয়ে) দিবেন আর মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত রূপে।’ (সূরায়ে আন্‌নাহ্‌ল,৬৪)

হাদীসের আলোকে ফিকাহর দ্বিতীয় উৎস

পবিত্র কোরআনের ন্যায় হাদীসে রাসুলেও এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, কোরআনের পর সুন্নাহ হচ্ছে শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। যেমন, সাহাবায়ে কেরামকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ তোমরা সেভাবে নামায পড়ো।

হজ্বের ক্ষেত্রেও একইভাবে ইরশাদ হয়েছে–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ

তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের যাবতীয় আহকাম শিখে নাও।'

শরীয়তে কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

'আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে গেলাম যা আকড়ে ধরলে কখনো তোমরা বিচ্যুত হবে না। আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ (হাদীস)।

এ মর্মে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো এখানে একত্র করা আমাদের উদ্দেশ্যও নয় আর বর্তমান পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবে আর একটি হাদীস অবশ্যই উল্লেখ করব, যা আলোচ্য বিষয়ে সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিস্তারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়া'য (রাঃ)কে ইয়ামানের প্রশাসকরূপে প্রেরণ কালে বিদায় লগ্নে জিজ্ঞাসা করলেন,

---

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। একটি কিতাব, অপরটি হিকমাত। আল্লামা ইবনে কাছীর, ইমাম শাওকানী, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখ এখানে কিতাব ও হিকমাতের অর্থ করেছেন 'কোরআন ও সুন্নাহ'। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১খঃ, পৃঃ ৪২৫। তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, ১খঃ, পৃঃ ৩৯৫। তাফসীরে আবুস-সাউদ, ১ঃখ, পৃঃ ১০৯। মুখতাসার তাফসীর আল-তাবারী, ১খঃ পৃঃ১৩০।

এছাড়া অধিকাংশ তাফসীর বিশারদগণের মতে, এখানে 'হিকমাত' দ্বারা সুন্নাহকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ পাক এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি হলো, কিতাব বা কোরআন। দ্বিতীয়টি হিকমাত, যার অর্থ সুন্নাতে রাসূল বলে আমার দেশের জনৈক বিজ্ঞ আলেম মন্তব্য করেছেন, যা যুক্তিযুক্তই মনে হয়। (আল্লাহ ভাল জানেন) কেননা, আল্লাহ এখানে কিতাব তথা কোরআনের পর 'হিকমাত' শব্দ উল্লেখ করেছেন, তদ্রূপ তাঁর অনুগ্রহের উল্লেখ প্রসংগে রাসূলের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। কাজেই এখানে হিকমাত অর্থ সুন্নাতে রাসূল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। (আর-রিসালাহ, ৭৮পৃঃ)

কোন সমস্যা দেখা দিলে কিভাবে তুমি তার সমাধান করবে? মুয়ায (রাঃ) বললেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে সমাধান করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে? মুয়ায (রাঃ) বললেন, তখন সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোকে সমাধান করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তাতেও যদি কোন সমাধান না পাও? হযরত মুয়ায (রাঃ) বললেন, তবে আমি নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

'আলাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টিজনক কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, দারামী, তাবাকাতে ইবনে আবি সাআদ, জামেউ বায়ানিল ইলম।)

সাহাবা ও ইমামদের দৃষ্টিতে ফিকাহ'র উৎস

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের ইমামদের কারোই এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না যে, কোরআনের পর সুন্নাহই শরীয়ত ও ফিকাহ'র দ্বিতীয় উৎস। দু' একটি নমুনা দেখুন।

(এক) সাফওয়ান ইবনে মুহরিব (?) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে 'কছর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ

(কছর হচ্ছে চার রাকাতের পরিবর্তে) দু' রাকাত। যে সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের পুত্র হযরত বেলাল বলেন, একদিন আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসে রাসূল শোনালেন-

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ

'নারীদেরকে তোমরা মসজিদে যাওয়ার হক থেকে বঞ্চিত কর না।'

আমি বললাম, আমি আমার পরিবারকে অবশ্যই বারণ করব। কারো ইচ্ছা হলে বউ নিয়ে ঘুরে বেড়াক। তিনি আমার দিকে ফিরে ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। আমি হাদীসে রাসূল শোনাচ্ছি আর তুমি বিরুদ্ধাচরণ করছ?

(তিন) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন–

'মানুষের মাঝে যতদিন হাদীসের তলব থাকবে ততদিন তাদের কল্যাণ হবে। যখনই তারা হাদীসবর্জিত জ্ঞান চর্চা শুরু করবে তখনই তারা বরবাদ হবে। (মীযানুল কুবরা, ১খঃ, ৫১পৃঃ)

(চার) তিনি আরও বলেন–

'আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে স্ব–চিন্তাদ্ভুত কোন মন্তব্য করার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। আর সুন্নতে রাসূল অনুসরণে যত্নবান হবে। কেননা, সুন্নতে রাসূল থেকে যে বিচ্যুত হবে সে গোমরাহ হবে। (মীযানুল কুবরা, ১ঃ ৫০)

(পাঁচ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন–

'হাদীস শোনার পরও যদি আমি অন্যমত পোষণ করি তাহলে কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে; আর কোন জমিন আমাকে ধারণ করবে? (আসারুল হাদীস)

(ছয়) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আরও বলেন,–

আমার কিতাবে 'সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী কোন কথা পেলে আমার কথা বর্জন করে সুন্নাতে রাসূলই তোমরা গ্রহণ করবে।' (মানাক্বিবুশ্–শাফেয়ী লিল–বাইহাকী, ১ঃ ৪৭৪। হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯খঃ, ১০৬। আদাবুশ্ শাফেয়ী, ৬৭)

(সাত) হাদীসের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে ইমাম মালেক (রঃ) বলেন–

'হাদীস হল নূহের কিশতি। তাতে আরোহণকারী নাজাত পাবে আর তা পরিত্যাগকারী ডুবে মরবে। (তাওয়ালিত্তাসীস্, ৬৩। মানাক্বিবুশ শাফেয়ী লিল–বাইহাক্বী, ১ঃ ৪৭২)

(আট) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও সুন্নাতে রাসূল উপেক্ষাকারীকে ধ্বংসের পথের যাত্রী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন–

'আমার জানামতে হাদীস চর্চার প্রয়োজন বর্তমানের মত অতীতে আর কখনো দেখা দেয়নি। কেননা, বিদ'আতের এমন প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যে, হাদীস জানা না থাকলে মানুষ নির্ঘাত বিদ'আতের শিকার হবে।; (মিফতাহুল জান্নাহ)

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি এ সত্য সুপ্রমাণিত হয়ে গেছে যে; ফিকাহ বা শরীয়তের আহকাম আহরণের সর্বপ্রধান উৎস হলো, কিতাবুল্লাহ, অতঃপর সুন্নাতে রাসূল। কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কোন মতামত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবা কেরাম এবং পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাহিদদের আকীদা ও আমলও ছিল অনুরূপ। কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাঁরা আহকাম ও বিধান আহরণ করতেন। কোন বিষয়ে কোরআন সুন্নায় প্রত্যক্ষ বিধান না পেলে চিন্তা ও ইজতিহাদ দ্বারা আহকাম আহরণ করতেন। কিন্তু সেটা তাদের নিজস্ব মতামত নয়। কোরআন সুন্নহারই প্রচ্ছন্ন বিধান মাত্র। এখানে এসে দুর্বল মনে সাধারণতঃ যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই যে, কোরআন সুন্নাহর অভিন্ন উৎস থেকেই যদি সকল মুজতাহিদ মাসআলা আহরণ করে থাকেন তাহলে তাদের মাঝে মতপার্থক্যের কারণ কি? ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ফতোয়া সহী হাদীসেরই বা পরিপন্থী হয় কেন?

বস্তুতঃ এ প্রশ্নের সমাধান পেশ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই মূল আলাচনায় প্রবেশের জন্য এতক্ষণ আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছি। আসুন, বুঝার ম'নোভাব নিয়ে এবং সত্য অন্বেষণের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে বিষয়টি আমরা আলোচনা করে দেখি, কেন ইমামদের মাঝে মতাপার্থক্য হতো এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মতপার্থক্যের স্বরূপই বা কী?

মতপার্থক্যের কারণ সমূহ

১। ক্বেরাতের বিভিন্নতা

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত ভিন্ন ভিন্ন অর্থের একাধিক কিরাআ'তে (তেলাওয়াত পদ্ধতিতে) বর্ণিত রয়েছে যার কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে অথবা উভয় অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে ইমামদের মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআনে অযু প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

'আর টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করবে)। (সূরায়ে মায়েদাহঃ ৬)

এখানে ارجلكم শব্দটি দুই কেরাতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রথম ক্বিরাত হলো, اَرجُلَكم (লামের উপরে যবর), যার অর্থ দাঁড়ায় মুখ ও হাতের সাথে পা দু'টোও ধৌত করতে হবে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ক্বেরাতকেই গ্রহণ করে ফতোয়া দিয়েছেন, পা ধৌত করা অযুর ফরযের অন্তর্ভুক্ত।১

১। তাদের যুক্তি হল–

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও অযু করতে গিয়ে মোজা ছাড়া খালি পায়ে মাস্হ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

(২) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে একবার সফরে সাহাবায়ে কেরামকে অযুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মাস্হ করতে দেখে কঠোরভাবে ধমক দিলেন যে, 'তোমাদের পায়ের শুক্না অংশটুকু জাহান্নামে যাবে।' আর এ জাতীয় সতর্কবাণী ফরয উপেক্ষা করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই বুঝা গেল, পা ধৌত করাই ফরয।

(৩) আল্লাহ পাক হাতের বেলায় যেমন কনুই পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। পায়ের বেলায়ও টাখনু পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন, যা ধোয়ার বেলায়ই সম্ভব।

(৪) তাছাড়া 'পা' ধৌত করলে অযু বিশুদ্ধ হওয়া নিশ্চিত কেননা, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; পক্ষান্তরে শুধু মাস্হকারীর অযু বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কাজেই সুনিশ্চিত ও মতবিরোধমুক্ত দিকটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ অর্থে এ কথাও বলা যায় যে, ধৌত করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

পক্ষান্তরে অপর একটি ক্বিরাত রয়েছে اَرجُلِكم। (লামের নীচে যের), এ কেরাতের প্রেক্ষিতে শব্দটির সম্পর্ক হবে رؤوس (মাথা)র সাথে; যার অর্থ দাঁড়াবে, মাথার মত পাও মাস্হ করলেই চলবে। ধৌত করা আবশ্যক নয়। এ ক্বিরাতের প্রেক্ষিতে অনেকেই জমহুরের মতের খেলাফ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।১

১। যেমন, (ক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অযুর ফরয হল (মুখ ও হাত) ধৌত করা এবং (মাথা ও পা) মাস্হ করা।'

(খ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পায়ের ব্যাপারে কোরআনে মাস্হের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর হাদীসে ধোয়ার হুকুম করা হয়েছে।

(গ) হযরত ইকরামাহ অযুতে পা মাস্হ করতেন এবং বলতেন, পা' ধোয়ার নির্দেশ নেই; বরং তাতে মাস্হ করার নির্দেশ রয়েছে।

(ঘ) হযরত কাতাদাহ বলেনঃ আল্লাহ পাক অযুতে দু'টি অঙ্গ ধোয়া আর দু'টি মাস্হ করা ফরয করেছেন।

(ঙ) ইবনে জারীর আল তাবারীর মত হল; পায়ের ব্যাপারে ফরয হল ধোয়া অথবা মাস্হ করা। (তাফসীরে কুরতুবী থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)

২। কোন হাদীস মুজতাহিদ ইমামের সংগ্রহে না থাকা

প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব আহকাম একই সময় এবং সকল সাহাবীর সম্মুখে বর্ণনা করেননি; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে, একটি হাদীস মাত্র দু' একজন ছাড়া কেউ শুনেননি। তদ্রূপ সব সাহাবার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সব সময় হাযির থাকা সম্ভব হয়নি। কেউ সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে খেয়ে না খেয়ে ছায়ার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে ইল্‌মে নববী হাসিল করতেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) দেশে বিদেশে সব সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম–এর সঙ্গে থাকতেন। তদ্রূপ আসহাবে সুফ্‌ফার সাহাবীগণ (রাঃ)

বিশেষতঃ হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) মসজিদে নববীর চত্বরে সর্বদা ইল্‌ম হাসিলের জন্য পড়ে থাকতেন।

পক্ষান্তরে অনেককে মাত্র সামান্য কিছু সময় দরবারে রিসালাতে থেকে পূনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যেতে হয়েছে, আর কোনদিন উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। কাজেই সব সাহাবীর পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ যারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন তাঁদের পক্ষেও সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসীনের বেলায়ও তাই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যেও কারও পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।১

১। এ মর্মে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

আমাদের জানা মতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন; কোন হাদীস্‌ই তার ছুটে যায়নি। বরং সকল আলেমের ইল্‌মের ভাণ্ডার একত্রিত করলেই সমস্ত হাদীস একত্রিত করা সম্ভব হবে। তাঁদের প্রত্যেকের ইল্‌মের ভাণ্ডার পৃথক করলেই দেখা যাবে প্রত্যেকেরই সংগ্রহে হাদীস শাস্ত্রের বেশ কিছু অংশের অনুপস্থিতি ঘটেছে যা অন্যদের ভাণ্ডারে মজুদ রয়েছে। ইল্‌মের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে অবশ্যই স্তরভেদ রয়েছে। অনেকে অধিকাংশ হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন; যদিও কিছু হাদীস তাঁদের সংগ্রহে আসেনি। পক্ষান্তরে অনেকে অন্যদের তুলনায় সামান্য সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। (শীর্ষ ভাগই তাঁর ছুটে গিয়েছে।)

এ দাবীটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করে শেষের দিকে লিখেছেন,

'সব ইমাম বা কোন বিশেষ ইমাম সব সহী হাদীসই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, এমন ধারণা যে করবে সে মারাত্মক ভুলের শিকার হবে।

ইমাম বিকায়ী স্বীয় উস্তাদ আল্লামা ইবনে হাজারের মন্তব্য নকল করেন,

'অর্থাৎ, উম্মতের কারও ব্যাপারে এ দাবী করা যায় না যে, তিনি সকল হাদীস সংগ্রহ, স্মরণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এমনও বলেছেন, কোন এক ব্যক্তির সংগ্রহে সব হাদীস রয়েছে বলে যে দাবী করবে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপ সেও ফাসেক বলে গণ্য হবে যে বলবে, কিছু হাদীস উম্মতের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারও সংগ্রহেই নেই।

কাজেই, কোন মাসআলার সমাধানে যিনি সহী হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি সে অনুযায়ী মাসআলা পেশ করেছেন। অপরপক্ষে যিনি সহী হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি, তিনি বাধ্য হয়ে অন্যান্য যুক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। ফলে অনেক সময় তাঁর মত আল্লাহ পাকের খাস কুদরতে হাদীসের অনুকূল হয়েছে। আবার অনেক সময় হাদীসের বিপরীতও হয়েছে; যার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য। বরং হাদীসের অনুকূল সিদ্ধান্ত নিতে পেরে যেমন তিনি দুটি পূণ্যের অধিকারী হতেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি একটি পূণ্যেরঅধিকারীহবেন।১

১।বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী আম্‌র বিন আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر

'কোন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হলে সে দুটি পূণ্যের অধিকারী হবে। আর (সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর) ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সে একটি নেকীর অধিকারী হবে। (মুশকিলুল আছার, ১খঃ, ৩২৬ পৃঃ, মুসনাদ ইমাম শাফেয়ী, ৩৫৫ পৃঃ)

সাহাবা ও পরবর্তী যুগে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

(এক) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তঃ একদা তাঁর কাছে দাদীর মীরাস সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, দাদী মীরাস পাবে বলে কোরআন হাদীসের কোথাও কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আমি অন্যদের কাছে জেনে দেখব। অতঃপর তিনি সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ ও মুহাম্মদ বিন সালামাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ মীরাস দিয়েছেন। (রাফউল মালাম, ৬ মুসনাদে ইমাম আহমদ থেকে)

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)র মত ব্যক্তিত্ব, যিনি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেন এবং ঈমান গ্রহণের পর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধান পর্যন্ত কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি।

এতদসত্ত্বেও এ হাদীসটি তার সংগ্রহে ছিল না, যা একজন সাধারণ সাহাবীর সংগ্রহে ছিল।

হযরত ওমরের (রাঃ) দৃষ্টান্তঃ

সহী বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, একদিন হযরত আবু মুসা আস'আরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট এসে তিনবার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেলেন। (অন্য সময়) যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ফিরে গিয়েছিলেন কেন? জবাব দিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েও আনুমতি পাইনি; তাই ফিরে গিয়েছি। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

'তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়াই তার কর্তব্য।'

এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়, অনুমতি সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর জানা ছিল না, যা হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)র জানা ছিল।

(দুই) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)র দৃষ্টান্ত, যাতে তাঁর সিদ্ধান্ত হাদীসের অনুকূল হয়েছিলঃ

নাসায়ী শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)র নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল যে, জনৈক মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন। মহিলাটির 'মহর' নির্ধারিত করা ছিল না। (এখন তার মহর কোন হিসাবে আদায় করা হবে)। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জাতীয় কোন ফায়সালা করতে দেখিনি। অতঃপর তাদের মাঝে বিষয়টি অমীমাংশিত রয়ে গেল। ফলে বেশ বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এভাবে দীর্ঘ একটি মাস কেটে যাওয়ার পর হযরত ইবনে মাসউদ (অনন্যোপায় হয়ে) 'কিয়াস' (যুক্তি কেন্দ্রিক ইজতিহাদ) করে ফতোয়া দিলেন যে, তাকে 'মহরে মিস্‌ল' (পরিবারস্থ অন্যদের সমপরিমাণ) দেয়া হবে। কমও নয় বেশীও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে মিরাসেরও অংশীদার হবে।

হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) তখন বলে উঠলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক (বিধবা) মহিলার ব্যাপারে এই ফায়সালাই করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ কথা শুনে এত আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এমন আনন্দিত কোনদিন হননি। (নাসায়ী শরীফ)

এ ঘটনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারলাম, (ক) সংশ্লিষ্ট হুকুমটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর জানা ছিল না (খ) ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছেন (গ) আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে তার 'কিয়াস' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুকূল হয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) দৃষ্টান্তঃ

ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর ফতোয়া হল, কোন জিনিস ওয়াক্‌ফ করার পর সেটা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং যে কোন সময় ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যদি সেটা ওসিয়্যতের পর্যায়ে হয় বা শরয়ী' ক্বাজীর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবু হানীফার এ ফতোয়া ছিল জমহুর ইমামদের পরিপন্থী এবং সহী হাদীসের খেলাফ। কেননা, এ সংক্রান্ত হাদীস তাঁর জানা ছিল না। অপরপক্ষে সেই হাদীসের ভিত্তিতেই জমহুর ওলামায়ে কেরাম এমনকি ইমাম আবু হানীফার শাগরেদদ্বয় (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)) এর মতও তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হানাফী মাযহাবের ফতোয়াও তাই।

ইমাম আবু ইউসুফের মতও প্রথমতঃ ইমাম আবু হানীফার মতের অনুকূলেই ছিল। অতঃপর হাদীসটি পেয়ে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন,

এমন স্পষ্ট ও সহী হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধীকার কারো নেই। ইমাম আবু হানীফাও এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।

এখানে আমার উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম আবু হানীফার মত ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধু ফিকাহ শাস্ত্রেই নয় বরং হাদীস শাস্ত্রেও অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার পক্ষেও কোন কোন হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তিনি

সহী হাদীস ও জমহুরের মতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে তো অনেকের মন্তব্য যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। কাজেই তার জন্য এটা স্বাভাবিক ব্যাপারই ছিল। এর জবাব হল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ তার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অথবা নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে অনেকে এহেন অন্তসারশূন্য উক্তি করেছেন। তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিব; বিতর্কের মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইমাম আবু হানীফার (রঃ) জীবনী পড়ুন। তখন আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন যে, সত্যই তিনি হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং ইমামে আযম উপাধি তার জন্য যথাযথ ছিল। তাঁর মতানুসারীর সংখ্যা সব যুগেই গরিষ্ঠতা লাভ করেছে এমনিতেই তো আর নয়। বিষয়টি যেহেতু বেশ গুরুতর সেহেতু আমরা এ বইয়ের শেষের দিকে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) স্বীয় ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি। বরং সহী হাদীস পাওয়া মাত্রই নিজ ইমামের মত প্রত্যাখ্যান করে সহী হাদীসের উপরই আমল করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং সাথে সাথে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইমামের মতের কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা নিজেই সে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, আমার কোন মত যদি কোন সহী হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে। এরপরও যদি কেউ হানাফী ইমামদের প্রতি ইমামের মতের কারণে সহীহ হাদীস উপেক্ষা করার অপবাদ রটিয়ে বেড়ান তবে তাদের জবাব আমাদের কাছে নেই।

ইমাম মালেক (রঃ)র দৃষ্টান্তঃ

ইমাম মালেক (রঃ) সম্পর্কে তার শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বলেন, একদিন তাকে মাস্আলা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অযুর মধ্যে পায়ের আংগুল খিলাল করার গুরুত্ব কতটুকু? জবাবে তিনি বলেন, এটা জরুরী নয়। উপস্থিত লোকেরা চলে যাওয়ার পর তাঁকে বল্লাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন হাদীস, বলতো?

বললাম, সাহাবী ইবনে শাদ্দাদ আল কারশী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযুর সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পায়ের অঙ্গুলীর ফাঁকে খিলাল করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

ইমাম মালেক (রঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে হাদীসটি 'হাসান'। এটি ইতিপূর্বে আমি কখনও শুনিনি। ইবনে ওয়াহাব বলেন, এরপর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি খিলাল করার নির্দেশ দিতেন। (তাকদিমাতুল জারহি ওয়া-ত্তা'দীল, ৩১ ; আল-ইসতিযকার, তাতে অবশ্য এ কথাও আছে যে, এরপর থেকে তিনি ওযুতে যত্নের সাথে খিলাল করতেন।)

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর দৃষ্টান্তঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আমাদেরকে বলেছেন, আপনারা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই, আপনাদের সংগ্রহে কোন হাদীস থাকলে আমাদের জানাবেন। তার রাবী যে কোন দেশেই হোক না কেন হাদীসটি সহীহ হলে আমি তার কাছে যাবো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া-৯ঃ ১০৬পৃঃ)

এখানে ইমাম শাফেয়ীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অনেক হাদীস তার সংগ্রহে ছিল না; তাই তাঁকে ইমাম আহমদের (রঃ) শরণাপন্ন হতে হয়।

ইমাম আহমদের দৃষ্টান্তঃ

আলী ইবনে মুসা আল হাদ্দাদ বলেন, একদা আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ও মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ আল-জাওহারীর সাথে কোন এক জানাযায় শরীক ছিলাম। দাফন কার্য সমাধা হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করল। ইমাম আহমদ (রঃ) বললেন,

হে ভাই! কবরের পাশে কোরআন পাঠ করা বিদ'আত।

অতঃপর কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদ ইবেন কুদামাহ তাঁকে বললেন, ইবনুল–লাজলাজ তার ছেলেকে আসীয়ত করেছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মাথার পাশে সূরায়ে বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করতে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি ইবেন ওমরকে এ অসীয়ত করতে শুনেছি। এ কথা শুনে ইমাম আহমদ (রঃ) বললেন, লোকটিকে পাঠ করতে বলে এসো।

সারকথা, উল্লেখিত ঘটনাগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবাদের এবং পরবর্তী যুগের ইমামদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না যার নিকট সব হাদীসই সংগৃহীত ছিল। বরং লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগহ করা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হাদীস ছুটে গিয়েছে। ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে অন্য দলীলের নিরিখে ফতোয়া প্রদান করেছেন; যার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এ ফতোয়া সহীহ হাদীসের এবং অন্যান্য ইমামদের মতের পরিপন্থী হয়েছে। অতঃপর অনেক ক্ষেত্রে তার জীবদ্দশাতেই সহী হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি নিজমত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে শাগরিদদের কেউ হাদীসটি পেয়ে ইমামের মতকে সংশোধন করে নিয়েছেন। যেমন, আবু ইউসুফের ঘটনাটিতে আমরা স্পষ্ট দেখে এসেছি। তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ইমামের কোন মত সহী হাদীসের বা অন্যান্য ইমামদের মতের সাথে পরিপন্থী হওয়ার সম্ভাব্য অনেকগুলো কারণের (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) মধ্যে এটা একটা কারণ মাত্র। কাজেই, কোন ইমামের কোন মত বাহ্যতঃ হাদীসের পরিপন্থী পেলেই চক্ষু বন্ধ করে বলে দেয়া যাবে না যে, তিনি এ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং অন্য কোন কারণ আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

একটি সংশয়ের নিরসনঃ

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসশাস্ত্র তো সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই ইমামদের হাদীস ছুটে যাওয়ার কারণ কি? যার ফলে তাদেরকে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এর জবাব হল, প্রথমতঃ এমন কোন হাদীস গ্রন্থ নেই যার মধ্যে সব হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে।১

১। ইমাম নববী (রঃ) বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে লিখেছেন,

و لم يستوعبا الصحيح و لا التزماه (التقريب و التيسير)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের রচিত সহীহ গ্রন্থগুলোতে সকল 'সহীহ' হাদীসের সমাবশে ঘটাননি। তাঁরা সে চেষ্টাও করেননি। ইমাম বুখারী নিজেই বলেন,

ما ادخلت في كتاب الجامع الاما صح و تركت من الصحاح مخافة الطول

'আমি এ জামে গ্রন্থে (বুখারী শরীফ) সহীহ ব্যতীত অন্য কোন হাদীসের সমাবেশ ঘটাইনি। আর কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে অনেক 'সহীহ' হাদীসও ছেড়ে দিয়েছি। (তাদরীবুর রাবী–৭৪)
ইমাম বুখারী আরও বলেন,

صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة الف حديث

'আমি 'সহীহ' গ্রন্থটি ১৬ বছরে সংকলন করেছি এবং তাতে ছয় লক্ষ হাদীস হতে (বেছে এ হাদীসগুলো) সংকলন করেছি। আর এটাকে আমি আমার ও আল্লাহ তাআ'লার মাঝে দলীল স্বরূপ নির্ধারিত করে রেখেছি (বুখারীতে সর্বমোট ৭২৭৫ টি হাদীস রয়েছে।)

(ما تمس حاجة القاري لصحيح الامام البخاري ص ٤١ و ٤٥ طباعة دار الفكرعمان)

ইমাম মুসলিম (রঃ) বলেন,

و ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، انما وضعت ما اجمعوا عليه

আমার নিকট সংগৃহীত সকল 'সহীহ' হাদীস এ কিতাবে সংকলন করিনি। বরং যে সব হাদীসের (বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) সকলে একমত সেগুলোই সংকলন করেছি।

কাজেই এ ধরনের দু' একটি কিতাবের উপর ভরসা করে কি ফিকাহ শাস্ত্রের সকল সমস্যার সমাধান বের করা বা ফেকাহ শাস্ত্রের এ বিশাল ভাণ্ডার তৈরী হওয়ার কথা কল্পনা করা যায়? তাছাড়া শুধু কিতাবের মধ্যে হাদীসগুলো সংরক্ষিত থাকাই তো যথেষ্ট নয়, মুখস্থ থাকারও তো প্রশ্ন রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস গ্রন্থগুলোর প্রায় সব ক'টি সংকলিত হয়েছে ইমামদের পরবর্তী যুগে। কাজেই এ প্রশ্ন ইমামদের প্রতি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়তঃ পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে যে পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করেছেন পূর্ববর্তী ইমামদের স্মৃতি ভাণ্ডারে এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষিত ছিল। কেননা, তাঁরা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী যুগের। কাজেই তাদের কাছে সহী সনদে (বিশুদ্ধ সূত্রে) এমন সব হাদীস পৌছেছে, যা পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীনের নিকট পৌছেনি, অথবা দুর্বল সূত্রে বা অগ্রহণযোগ্য সূত্রে পৌছেছে। কাজেই এসব হাদীস গ্রন্থের

উপর ভিত্তি করে তাঁদের উপর কোন প্রশ্নের অবতারণা করা অবাঞ্ছনীয় নয় কি?

তৃতীয় কারণঃ কোন হাদীস আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত না হওয়া

অর্থাৎ, কোন একটি হাদীস কারো নিকট বিশুদ্ধ ও আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য জনের নিকট তা প্রমাণিত হয়নি। এই মূল মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাগুলোতে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ মূল মতপার্থক্যের কয়েকটি উৎস হতে পারে।

প্রথম উৎসঃ অগ্রহণযোগ্য সনদে হাদীস প্রাপ্ত হওয়া

এ আলোচনার পূর্বে প্রথমে আমরা মৌলিক কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী যুগের ইমামদের নিকট কোন হাদীস পৌছার পর হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রকার যাচাই বাছাই না করেই তারা আমল করা শুরু করতেন না। বরং হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা এবং আমল করার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট 'দাদীর মিরাস' সংক্রান্ত হাদীসটি পৌছার সাথে সাথেই সে অনুযায়ী ফায়সালা করেননি বরং তিনি প্রথমে তার বিশুদ্ধতায় নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হল, একদা জনৈকা মহিলা (যিনি সম্পর্কে কোন মৃত ব্যক্তির দাদী ছিলেন) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এসে জানতে চাইলেন, তিনি তাঁর নাতির মীরাস পাবেন কি না? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার জানা মতে কোরআন-হাদীসের কোথাও নাতির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে দাদী কোন অংশ পাবে বলে উল্লেখ নেই। তবে তুমি এখন চলে যাও। আমি অন্যান্য সাহাবীদের নিকট জেনে দেখি। অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে হযরত মুগিরাহ ইবনে শু'বাহ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আর কেউ (সাক্ষী) আছে কি? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে একই সাক্ষ্য দিলেন। তখন এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) মীরাসের ফয়সালা করলেন।

দ্বিতীয়তঃ কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার উপর। বর্ণনাকারী যতই বিশ্বস্ত স্মরণশক্তি সম্পন্ন হবেন হাদীসের গুরুত্বের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, বর্ণনাকারীর অসাধুতার পরিমাণ যত বেশী হবে হাদীসটি ততই দুর্বল বলে পরিগণিত হবে। বর্ণনাকারী যদি একেবারেই অসাধু হয় এবং অসত্য ভাষণে অভ্যস্ত ও জাল হাদীস রচনায় অভিযুক্ত হয়ে থাকে তবে সত্য বললেও তার কোন হাদীসই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে সে সত্য বলেছে।

তৃতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে একই হাদীস বিভিন্ন ইমামের নিকট বিভিন্ন সনদে (সূত্র পরম্পরায়) পৌছেছে। কারো নিকট সহী সনদে, কারো নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সনদে পৌছেছে। ফলে যার নিকট সহী সনদে পৌছেছে তিনি হাদীসটিকে সহী বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে যার নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সূত্রে পৌছেছে তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

তাছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের ইমামদের মাঝে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ তফাৎ রয়েছে। কেননা, পূর্ব যুগের ইমামগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী যুগের। ফলে তাদের পক্ষে মাত্র দুই বা তিন সূত্রে হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের ইমামদের মাঝে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ হওয়াতে তাঁদের হাদীস সংগ্রহ করতে সূত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বলাবাহুল্য যে, সূত্রের সংখ্যা যতই কম হবে সনদের বিশ্বস্ততা অক্ষুন্ন থাকা এবং হাদীসের কথা অবিকৃত থাকার সম্ভাবনা ততই বেশী হবে। পক্ষান্তরে সূত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে সনদের বিশ্বস্ততা ততই লাঘব হবে এবং হাদীসের বাক্য বিকৃতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনাও ততই অধিক হবে। কাজেই, পূর্ববর্তী যুগের লোকদের পক্ষে স্বভাবতঃই বিশ্বস্ত সূত্রে এবং অধিক সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করা যতটা সম্ভব হয়েছিল ততটা পরবর্তীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনুরূপ, একই হাদীস পূর্বযুগের লোকেরা সঠিক সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের লোকদের কাছে পৌছতে গিয়ে সূত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিশ্বস্ততায় বিঘ্ন ঘটেছে অথবা বিকৃতি এসেছে। ফলে তাঁদের দৃষ্টিতে সেটি যয়ীফ বলে বিবেচিত হয়েছে।

এ মৌলিক ও দীর্ঘ আলোচনার পর এবার আমরা অনায়াসেই নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি–

(এক) হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি অনেকটা আপেক্ষিক। কাজেই কোন হাদীস এক ইমামের দৃষ্টিতে সহী হলে সকলের দৃষ্টিতে সেটা সহী হওয়া জরুরী নয়; বরং অন্যদের দৃষ্টিতে দুর্বল বলে বিবেচিত হতে পারে।

(দুই) এই মূল মতবিরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলোতে স্বভাবতঃই মতবিরোধ দেখা দিবে। কেননা, কোন ইমামই তো কোন হাদীস পাওয়ার পর তার বিশুদ্ধতা যাচাই বাছাই না করে আমল শুরু করে দেননি। কাজেই যাঁর কাছে হাদীসটি সহী সূত্রে পৌঁছেছে, তিনি তারই ভিত্তিতে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন। পক্ষান্তরে অপরজন যেহেতু অগ্রহণযোগ্য সূত্রে হাদীসটি পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট কোরআন ও হাদীসে এর পরিপন্থী অন্যান্য প্রবল যুক্তি রয়েছে। কাজেই তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ করতে পারেননি।

আর এ ব্যাপারে তিনি অপারগই বটে। সাহাবাদের যুগে ও ইমামদের যুগে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে শুধু হযরত ওমরের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ক্ষান্ত হবো।

সূরায়ে তালাকের প্রথম আয়াতের ভিত্তিতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)র ফতোয়া ছিল যে, তার ভরণ–পোষণ ও বাসস্থান দু'টোই বহন করার দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে। অতঃপর যখন তাঁর নিকট ফাতেমা বিনতে কাইসের এই হাদীসটি পৌছল–

(মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ফাতেমা বিনতে কাইস বলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়েছিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান অথবা ভরণ–পোষণ কোনটিরই হুকুম দেননি।

হযরত ওমর (রাঃ) হাদীসটি শুনে মন্তব্য করেন,

'এমন একজন মহিলার কথায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নতকে উপেক্ষা করতে পারি না যার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই যে, বিষয়টি তার স্মরণ রয়েছে না ভুলেই গিয়েছে।

কাজেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ভরণ–পোষণ ও বাসস্থান দু'টোই পাবে।

কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন। (অতঃপর তিনি সূরায়ে তালাকের প্রথম আয়াতটি পাঠ করেন)

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, অধিকাংশ ইমামই এসব পরিস্থিতিতে নিজ মন্তব্য পেশ করার সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এর বিপক্ষে কিন্তু একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে (বিশুদ্ধ সূত্রে না পাওয়ায় তা গ্রহণ করতে আমি সক্ষম হইনি।) হাদীসটি সহী বলে প্রমাণিত হলে সেটাই হবে আমার মত।

(তিন) যেহেতু হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি অনেকটা আপেক্ষিক কাজেই কোন হাদীসকে যাঁরা সহী বলে মন্তব্য করেছেন তাঁদের মন্তব্যের ভিত্তিতে অন্য ইমামদের সম্পর্কে বলা ঠিক নয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করছেন।

অনুরূপ, যাঁরা যয়ীফ বা অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন তাঁদের মন্তব্যের ভিত্তিতে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে 'অপবাদ' চাপিয়ে দেয়া যাবে না যে, তাঁরা যয়ীফ বা 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য) হাদীস ভিত্তিক ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের এ ফতোয়া ভুল। কেননা, তিনি তো হাদীসটি সহী সনদে পেয়েছেন।

অনুরূপ, প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর রচয়িতা মুহাদ্দিসগণ প্রায় সবাই ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও অনুসরণীয় ইমামদের পরের যুগের।১

১। ফুকাহা কেরামের মধ্যে–
ইমাম আবু হানীফা (রঃ)র জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৫০
ইমাম মালেক (রঃ)র জন্ম ৯৩ হিজরীতে, মৃত্যু ১৭৯
ইমাম শাফেয়ী (রঃ)র জন্ম ১৫০ হিজরীতে, মৃত্যু ২০৪
ইমাম আহমদ (রঃ)র জন্ম ১৬৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৪১
অপরপক্ষে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে
ইমাম বুখারী (রঃ)র জন্ম ১৯৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৫৬
ইমাম মুসলিম (রঃ)র জন্ম ২০৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৬১
ইমাম নাসায়ী (রঃ)র জন্ম ২১৫ হিজরীতে, মৃত্যু ৩০৩
ইমাম আবু দাউদ (রঃ)র জন্ম ২০২ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৫
ইমাম তিরমিযি (রঃ)র জন্ম ২০৯ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৯
ইমাম ইবনে মাজা (রাঃ)র জন্ম ২০৭ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৩

কাজেই পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের কোন গ্রন্থের মন্তব্য দ্বারা ইমামদের প্রতি আপত্তি করা মোটেই সঙ্গত হবে না, বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যেহেতু সাবার আগের যুগের ছিলেন এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ছিলেন প্রায় এক শতাব্দী পরের সেহেতু বুখারী ও মুসলিমের কোন সহী হাদীস দেখেই এ মন্তব্য করে দেয়া যাবে না যে, ইমাম আবু হানীফা ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করেছেন।

অনুরূপ, বুখারী মুসলিমে অথবা সিহা সিত্তায় কোন হাদীস নেই বলেই এ মন্তব্য করা যাবে না যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় অথবা দুর্বল। কেননা, নিঃসন্দেহে পূর্বযুগের ইমামগণের সংগ্রহে এঁদের তুলনায় হাদীস সংখ্যা অধিক ছিল এবং তাঁদের সূত্র ছিল এঁদের তুলনায় অধিক প্রবল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বেশ উদারতার সাথে এ বাস্তবতা স্বীকার করে লিখেছেন,

বরং এসব হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা এঁদের তুলনায় সুন্নতে রাসূল সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা, এমন অনেক হাদীস তাদের কাছে পৌঁছেছে এবং সহী বলে প্রমাণিত হয়েছে যা আমাদের নিকট মোটেই পৌঁছেনি কিংবা অপরিচিত বা মুনকাতি' (মধ্যসূত্র বিচ্ছিন্ন) সনদে পৌঁছেছে। (রাফউল মালাম আ'নিল আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১২ দারুল কুতুব বইরুত কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ)

দ্বিতীয় উৎসঃ 'ইত্তিসালে সনদ' (সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা)-র ক্ষেত্রে মত পার্থক্যঃ

(মূলতঃ এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, কোন হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

(এক) ইত্তিসালে সনদ (সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা ও কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়া)

(দুই) 'আদালতে রাবী' (বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হওয়া)

(তিন) 'যবতে রাবী' (হাদীসটি বর্ণনাকারীর নিখুঁতভাবে স্মরণ থাকা)

(চার) হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' (সূত্র ও কথা) বিরলতা ও অভিন্নতা থেকে মুক্ত হওয়া।

(পাঁচ) মারাত্মক ধরনের ব্যতিক্রমধর্মিতা ও আপত্তিদুষ্টতা থেকেও মুক্ত থাকা।

এ মৌলিক পাঁচটি শর্তের ব্যাপারে দ্বিমত নেই। কিন্তু এর বিস্তারিত বিশ্লেষণে এসেই মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রথম শর্ত হলো 'ইত্তিসালে সনদ' বা সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা। অর্থাৎ রাবী যার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তার সাথে সাক্ষাতের প্রমাণ পাওয়া। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এটা اللقاء নামে প্রসিদ্ধ।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী প্রমুখের শর্ত হল, জীবনে একবার অন্ততঃ সাক্ষাত ঘটেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। অপরপক্ষে ইমাম মুসলিম প্রমুখের শর্ত সামান্য শিথিল। তাদের দৃষ্টিতে বাস্তবে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়, বরং স্থান-কালের বিচারে সাক্ষাৎ সম্ভব বলে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। এ মূলনীতিতে মতের ভিন্নতার ভিত্তিতে একই হাদীসের মূল্যায়নের ব্যাপারে মতের অমিল দেখা দিয়েছে। যেমন, কোন হাদীসের সনদে রাবীদ্বয়ের পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি তখন সে হাদীসটি ইমাম মুসলিম প্রমুখ সহী বলে মন্তব্য করবেন। অপরপক্ষে ইমাম বুখারী প্রমুখের মন্তব্য বিপরীত হবে। ফলে, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম মুসলিম প্রমুখ যে সব ফতোয়া ইস্তিম্বাত করেছেন তাতে ইমাম বুখারী প্রমুখের সাথে মতের ভিন্নতা দেখা দিবে।

তৃতীয় উৎসঃ হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে মতপার্থক্যঃ

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন তাবেয়ী তাঁর উর্ধতন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বর্ণনা করে দেয়া। চাই সে সাহাবী নবীন হোন কিংবা প্রবীন।

উসুলে ফিকাহর পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন রাবী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি।[১]

১। আল্লামা আল-আমেদী তার রচিত আল-ইহ্কাম নামক কিতাবে লিখেছেন-

و صورته ان يقول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

হাদীসে মুরসালের ব্যাখ্যা এই যে, কোন বিশ্বস্ত রাবী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অথচ তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাৎ ঘটেনি। (আল-ইহকাম-২ঃ খঃ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

এ জাতীয় হাদীস দ্বারা মাসআলা ইস্তিম্বাত করা যাবে কিনা এ ব্যাপারেও ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে হাদীসে মুরসাল দুর্বল হাদীস বলেই বিবেচিত এবং ইস্তিম্বাতের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, ইমাম মুসলিম (রঃ) সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় লিখেছেন,

আমাদের ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের মূলনীতি অনুযায়ী হাদীসে মুরসাল দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা সহ অন্যান্য ফুকাহাদের মতে হাদীসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য।

ইমাম জামালুদ্দীন আল-যাইলায়ী বলেন,

হানাফী ওলামায়ে কেরাম হাদীসে মুসনাদের মত হাদীসে মুরসালকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনদের মধ্যে দু'শ শতাব্দি পর্যন্ত অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের এ নীতিই ছিল। কেননা, কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে মুরসাল (বিশেষতঃ শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের মুরসাল)কে উপেক্ষা করা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি শীর্ষভাগ উপেক্ষা করারই নামান্তর।

অনুরূপ, আল্লামা আল-আলা আল-বুখারী (রঃ) বলেন,

হাদীসে মুরসালকে উপেক্ষা করা সুন্নাহর একটি বিরাট অংশকে উপেক্ষা করার নামান্তর। কেননা, হাদীসে মুরসালের সংখ্যা এত বেশী যে, সকল হাদীসে মুরসালকে একত্রিত করাতে প্রায় ৫০ খণ্ডের মহাগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কয়েকটি পরিস্থিতি সাপেক্ষে হাদীসে মুরসাল গ্রহণ করে থাকেন। যেমন,

১। সাহাবীর হাদীসে মুরসাল ২। অথবা হাদীসটি অন্য সূত্রে মুসনাদরূপে বর্ণিত। ৩। হাদীসটির অনুকূলে কোন সাহাবীর ফতোয়া রয়েছে। ৪। হাদীসটির অনুকূলে অধিকাংশ আলেমের ফতোয়া রয়েছে। ৫। এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তিনি কোন অবিশ্বস্ত রাবীর ক্ষেত্রে 'ইরসাল' করে থাকেন না। যেমন, ইবনে মুসায়্যাব।[১]

১। হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে।
تدريب الراوي ١/١٥٩ -١٧١ محاسن الاصطلاح : ١٣ ، التبصرة و التذكرة ١/ ١٤٤
فتح المغيث ١/١٢٨، جامع التحصيل في احكام المراسيل، الباعث الحثيث ١.٧ - ٧٧٤

মোটকথা, এ মূলনীতিতে মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিবে। যেমন, কোন বিষয়ে যদি হাদীসে মুরসাল ব্যতীত অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যায়। তখন মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসে মুরসালটিকে যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মাসআলার সমাধানে অন্য যুক্তির শরণাপন্ন হবেন। অনুরূপ, যতক্ষণ হাদীসে মুরসালটি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি দ্বারা সমর্থিত না হবে ততক্ষণ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তা গ্রহণ করবেন না এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলাটির সমাধানে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হবেন। ফলে স্বভাবতঃই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে। যেমন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় জনৈক অন্ধ ব্যক্তি এসে মসজিদের ভিতরের একটি গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তা দেখে অনেকে (নামাযের মধ্যেই) হেসে ফেললেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে পুনরায় অযু করে নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন। (আল-মারাসীল-৭৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে ইবনে আবূ শাইবাহ-১ খঃ, ৪১ পৃষ্ঠা)

এজাতীয় আরও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী ওলামায়ে কেরাম উচ্চস্বরে হাসির কারণে নামাযের সাথে সাথে অযুও ভঙ্গ হওয়ার ফতোয়া পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে যেহেতু হাদীসগুলো মুরসাল এবং ইমাম শাফেয়ী- আরোপিত শর্তে উত্তীর্ণ নয়, উপরন্তু তা উসূলের পরিপন্থী। তাই ইমাম শাফেয়ীসহ জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসটি গ্রহণ করেননি।[১]

১। বিস্তারিত জানার জন্য আর-রিসালাহ, ৪৬৯ পৃঃ, নাসবুর-রায়াহ ১খঃ ৪৭-৫৩ পৃঃ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১খঃ, ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

চতুর্থ উৎসঃ রাবীর 'আদালত' (বিশ্বস্ততা) র মাপকাঠির ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

হাদীস সহী বলে প্রমাণিত হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল রাবী 'আদেল' তথা বিশ্বস্ত হওয়া। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু বিশ্বস্ততার মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। কারও বক্তব্য হল, কোন বর্ণনাকারী 'আদেল' হওয়ার জন্য তিনি মুসলমান হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকাই যথেষ্ট। কেউ বলেছেন, বরং এর সাথে বাহ্যিক ক্ষেত্রে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ থাকতে হবে। কেউ আরো কঠোরতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ উভয় ক্ষেত্রেই তার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হতে হবে। আরও মতপার্থক্য রয়েছে যে, কারো বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একজন ইমামের সাক্ষ্য যথেষ্ট না দু' জনের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অনুরূপ, কোন রাবীর বিশস্ততা ক্ষুণ্নকারী দুর্বলতাগুলো নির্ণয়ের ব্যাপারে মতপার্থ্যক্য রয়েছে। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোন রাবীর বিশেষ কোন দুর্বলতা এক ইমামের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা অন্য ইমামের হয়নি। ফলে একই রাবী সম্পর্কে কেউ বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করছেন অন্যরা অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করছেন। 'রেজালশাস্ত্র' খুললে খুব কম রাবীই পাওয়া যাবে যার সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

এমনকি ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আলী ইবনে মাদীনী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, যুহায়ের ইবনে হারব প্রমুখ ইমামও (কোরআনের উচ্চারিত রূপটিকে 'মাখলুক' বণে ফতোয়া দেয়ার দায়ে) ঘোর সমালোচনার শিকার হয়েছেন। একবার নিশাপুর এলাকার আলেম সমাজ ও জনসাধারণ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার নেতৃত্বে বেশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে ইমাম বুখারীকে অভ্যর্থনা জানান এবং অত্র এলাকার সকল ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন তাঁর দরসে হাদীসে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যেই তিনি কোরআনের উচ্চারণ 'মাখলূক' না গায়রে মাখলুক এ প্রশ্নের জাবাবে বললেনঃ

'আমাদের সকল কর্মই 'মাখলুক' আর আমাদের ভাষার উচ্চারণও আমাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত (কাজেই কোরআনের উচ্চারণ 'মাখলুক' হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়।)

এ জবাবের সাথে সাথেই সমস্ত এলাকা জুড়ে বিপুল হাঙ্গামার ঝড় বয়ে যায় এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে নিশাপুরের লোকেরা কোরআনের পরই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাবের সংকলক ইমাম বুখারীর সাথে যে অমানবিক ব্যবহার করেছে তা বলার মত নয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর সাথে বয়কট করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন–

'কোরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়। কোরআনের উচ্চারণকে যে 'মাখলুক' বলে ধারণা করে সে বিদ'আতী। তার সঙ্গে উঠাবসা করা যাবে না। কথাও বলা যাবে না। আজকের পর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কাছে যাবে তাকে তোমরা কলংকিত ধরে নেবে। কেননা, তার কাছে সেই যাবে যে তার মতানুসারী।

এ ঘোষণার ফলে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ও আহমদ ইবনে সালাম ব্যতীত সব শাগরিদই ইমাম বুখারীর সঙ্গ ছেড়ে দেন। এমনকি ইমাম মুসলিমও কি যেন ভেবে স্বীয় الجامع الصحيح। গ্রন্থে ইমাম বুখারীর কোন রিওয়ায়েত উল্লেখ করেননি। আর ইমাম যুহালী (রঃ)র রিওয়ায়েতগুলো তো আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। হাফেয ইবেন হাজার (রঃ) 'হাদইউস–সারী লি–ফাতহিল বারী'তে ইমাম মুসলিমের এ পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেনঃ

ইমাম মুসলিম সত্যিকার ইন্‌সাফের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা (তার দৃষ্টিতে বিতর্কিত) দু' জনের কারও রেওয়ায়েত নিজ হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এ বিষয়টি যুহালী ও তার শাগরিদ পর্যন্তই সীমিত থাকেনি বরং ইয়াহইয়া ইবনে যুহালী (রঃ) অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের নিকটও নিশাপুরের ঘটনাটি সম্পর্কে অবগতিনামা পাঠান। ইবনে আবূ হাতেম স্বীয় আল–জারাহ ওয়াত্তাদীল নামক কিতাবে ইমাম বুখারী সম্পর্কে লিখেছেন–

'আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ২৫০ হিজরী সনে আগমন করেন। আমার পিতা এবং আবু যারআ'হ রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন; অতঃপর যখন তাঁদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী লিখে পাঠালেন যে, 'বুখারী' নিশাপুরে লোক সমাবেশে (কোরআনের উচ্চারণ

'মাখলুক' বলে) ফতোয়া দিয়েছেন। এ সংবাদ প্রাপ্তির পর আমার পিতা ও আবু যারআ'হ রাযী তাঁরা উভয়ই ইমাম বুখারীর বরাতে হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দেন। বিষয়টি এমন জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এর ভিত্তিতেই উকাইলী (রঃ) আলী বিন আল মাদীনীর মত স্বনামধন্য মুহাদ্দিসকেও দুর্বল বর্ণনাকারীর তালিকাভুক্ত করেছেন।[১]

১। হাফেয যাহবী (রঃ) এ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে লিখেছেনঃ

'উকাইলী তোমার কি আকল নেই? তুমি কি জানো না, কার ব্যাপারে মুখ খুলেছ। আমি তোমার (এ মন্তব্যের) এমন কঠোর সমালোচনা করছি একমাত্র এ জন্যই যাতে এ মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে যেসব অহেতুক মন্তব্য করা হয়েছে তার নিরসন ঘটে।

তুমি হয়ত বেমালুম ভুলে গেছো যে, তুমি যাদের সমালোচনায় মেতে উঠেছো এদের সবাই তোমার তুলনায় অনেক গুণ বেশী বিশ্বস্ত। বরং তাঁরা এমন আরও অনেকেরই তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত, যাদেরকে তুমি তোমার যায়ীফ বর্ণনাকারীর ফিরিস্তিতে উল্লেখ করোনি। এ ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসই সংশয়ী হতে পারেন না।

বরং কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি এককভাবে কোন হাদীস সংগ্রহ করেন, তবে তো সেটা তার অধিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। সেই সাথে প্রমাণ করে যে, তিনি তার সমপর্যায়ের অন্যান্যদের চেয়ে অধিক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু, যদি তাদের কোন স্পষ্ট ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তবে ভিন্ন কথা এবং তখন সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হবে।

আচ্ছা, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকেই লক্ষ্য করে দেখ না, তাঁদের মধ্যে ছোট বড় এমন কোন সাহাবীই নেই যিনি কোন হাদীসের একমাত্র সংগ্রহকারী নন। তাবেয়ীনদের বেলায়ও তাই। তাদের প্রত্যেকের নিকটই এমন ইলম রয়েছে যা অন্যদের সংগ্রহে নেই।

মোটকথা, রাবীর আদালাত সম্পর্কিত বিষয়টি বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ ও বিতর্কিত। এ বিষয়ে রিজাল শাস্ত্র নামে সতন্ত্র এক শাস্ত্র তৈরী হয়েছে এবং অসংখ্য কিতাব লেখা হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তার বিশদ বিবরণ পেশ করা অসম্ভবই বটে। তবে এ আলোচনা দ্বারা এতটুকু অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, রাবীর বিশ্বস্ততার বিষয়টি যেহেতু বিতর্কিত, কাজেই তার রিওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারটিও বিতর্কিত হবে। ফলে হাদীসটি থেকে আহরিত মাসা'আলায় সৃষ্টি হবে মতভিন্নতা। অর্থাৎ, যার দৃষ্টিতে হাদীসটি সহী

ও আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তিনি আমল করেছেন। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তিনি হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই তার ব্যাপারে এ মন্তব্য করা যাবে না যে, তিনি হাদীস পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করেছেন।

পঞ্চম উৎসঃ রাবীর স্মরণ ও সংরক্ষণের পরিমাণের ব্যাপারে মতপার্থক্যঃ

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য মুহাদ্দিসীনের নিকট তৃতীয় শর্ত হল রাবীর تام الضبط পরিপূর্ণ স্মরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা থাকা। এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। তবে, এর বিশ্লেষণে এসে তাদের পরস্পরে মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মুহাদ্দিসীন রাবীর লিখিত সংরক্ষণ ও স্মৃতির সংরক্ষণ উভয়টিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)র শর্ত হল, হাদীসটি শুনার সময় থেকে রিওয়ায়েত করা পর্যন্ত রাবীর সম্পূর্ণ স্মরণ থাকতে হবে। মাঝে কখনো ভুলে গিয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ শর্তের প্রেক্ষিতে তার সাথে অন্যান্য ইমামদের অসংখ্য হাদীসের ব্যাপারে সহী যয়ীফ হওয়ার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সেখান থেকেই মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সূত্রপাত হয়েছে।

এখানে এসেও হয়ত কোন বিবেকশূন্য ব্যক্তি অন্যান্য ইমামের সত্যায়িত কোন হাদীস দেখে মন্তব্য করে বসবেন যে, ইমাম আবু হানীফা অমুক সহী হাদীসের পরিপন্থী মন্তব্য করেছেন। অথচ, তাঁর দৃষ্টিতে সে হাদীসটি যয়ীফ বলে বিবেচিত ছিল।

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য অন্যান্য শর্তগুলোতেও ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে সে আলোচনা আর করা হলো না।

ষষ্ঠ উৎসঃ দুর্বল হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্যঃ

ইমামদের নিজ নিজ শর্তানুযায়ী যে সব হাদীস বিশুদ্ধ বা হাসান বলে সাব্যস্ত হবে তার উপর আমল করার ব্যাপারে এবং এর ভিত্তিতে শরীয়তের

আহকাম ইস্তিম্বাত করার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু, দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এবং মুস্তাহাব আমলের বেলায় যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন।

এছাড়া শরীয়তের অন্যান্য আহকাম অর্থাৎ, হালাল হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (রঃ) যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন। (মিরকাত ১খঃ, ১৯ পৃঃ)

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামদের মন্তব্য শুনুন। হানাফী ইমাম ইবনুল হোমাম বলেনঃ

একান্ত 'মওযু' (জাল) না হলে যয়ীফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব বিষয় প্রমাণিত হবে। (ফাত্হুল ক্বাদীর-১খঃ, ৪১৭ পৃঃ)

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম নববী (রঃ) বলেন-

ওলামা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম ও অন্যান্যরা (একবাক্যে) মন্তব্য করেন, নিতান্ত 'মওযু' (জাল) না হলে যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে ফাযায়েল, তারগীব (উৎসাহ প্রদান) তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) এর ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয ও মুস্তাহাব। তবে, আহকাম (যেমন হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া আমল করা যাবে না। অবশ্য সতর্কতার বেলায়; যেমন, যদি কোন যয়ীফ হাদীস বেচা-কেনার কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিষেধ করে অথবা কোন বিবাহকে সমর্থন না করে তবে সে ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে তা থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব। কিন্তু, ওয়াজিব নয়।

মালেকী মাযহাবের শেষের দিকের জনৈক শীর্ষস্থানীয় ইমাম বলেন-

ইমাম মালেকের হাদীসে মুরসাল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে মুকাত্তা' ও মু'যাল তাঁদের মতে দলীলযোগ্য। কেননা, মৌলিক অর্থে এগুলো মুরসালের অন্তর্ভুক্ত।

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদের (রঃ) বিভিন্ন মন্তব্য বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে নাজ্জার আল হাম্বালী স্বীয় কিতাব শারহুল কাওকাবুল মুনীরে (২১ খঃ, ৫৭৩ পৃঃ) সে সব মন্তব্য উল্লেখ করে লিখেন, ইমাম সাহেব বলেনঃ হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে আমার নীতি হল, যয়ীফ হাদীসকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না, যতক্ষণ না তার বিপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। (আল-কাওকাবুল মুনীর-২খঃ, ৫৭৩ পৃঃ)

আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে আবূ হাতেমসহ মুহাদ্দিসদের একটি জামাতও আহকামের ক্ষেত্রে অন্য কোন আয়াত বা হাদীস না পেলে একেবারেই দুর্বল নয় এমন যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেন। অনুরূপ, ইবনে হাযম (রঃ) দোয়া কুনূতের ব্যাপারে বলেন

যদিও 'আছার' (সাহাবার কওল) দলীল নয়। কিন্তু দোয়া কুনূতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কোন দলীল পাওয়া যায়নি। কাজেই এটি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট যয়ীফ হাদীস কিয়াস অপেক্ষা উত্তম। আলী ইবনে হায্ম বলেন, আমাদের বক্তব্যও তাই। (আল-মুহাল্লা ৪খঃ, ১৪৮ পৃঃ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রঃ)র ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, একবার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন এক শহরে একজন মুহাদ্দিস রয়েছেন, কিন্তু তার সহী ও দুর্বল হাদীসের মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান নাই। আর একজন রয়েছেন যিনি কিয়াসপন্থী। সেখানে কোন মাসআলার সমাধানের জন্য কোন্ জনের কাছে যেতে হবে? জবাবে আব্বা বললেনঃ

মুহাদ্দিসের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিয়াসপন্থীর কাছে নয়। কেননা, যয়ীফ হাদীস কিয়াস অপেক্ষা প্রবল।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)ও কোন বিষয়ে অন্য কোন যুক্তি খুঁজে না পেলে হাদীসে মুরসালের উপর আমল করে থাকেন (অথচ, তাঁর দৃষ্টিতে 'হাদীসে মুরসাল' যয়ীফ হাদীস বলে বিবেচিত) (ফাত্হুল মুগীছ-১খঃ, ২৮৮ পৃঃ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বইরুত কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ)

হাদীসে মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার আর একটি ক্ষেত্র হল, কোন হাদীসের সম্ভাব্য দু'টি অর্থের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে হাদীসে

মুরসালকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম নববী (রঃ) বলেন,

'হাদীসে মুরসাল' দ্বারা তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান জায়েয।

মোটকথা, আহকামের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা নিয়ে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম গ্রহণ করেছেন। অনেকে শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটেই গ্রহণ করেননি। আর এ মৌলিক মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে একটি ভুল ধারণার অপনোদন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেকের ধারণা, যয়ীফ হাদীস কোন ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি ফাযায়েল, তারগীব ও তারহীবের ব্যাপারেও অনেকে যয়ীফ হাদীসকে অগ্রহণীয় মনে করেন। যেন যয়ীফ আর মওযু হাদীস একই পর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং হাদীসটিই যেন দুর্বল। বস্তুতঃ হাদীস সম্পর্কে বিশেষতঃ যয়ীফ হাদীসের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ ভুল ধারণার মূল কারণ। অথচ, আমরা উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে যে ধারণা পেলাম তা নিম্নরূপঃ

(এক) যয়ীফ হাদীস বলা হয় যার 'সনদের' বিশেষ কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই দুর্বলতার বিষয়টি স্বয়ং হাদীসের সাথে নয় বরং সনদের সাথে।

(দুই) হাদীসের সহী–যয়ীফ নিরূপণের বিষয়টি বিতর্কিত। কাজেই, কোন একজন মুহাদ্দিস যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন বলেই হাদীসটির প্রতি বীতঃশ্রদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কেননা, হয়ত অন্যদের সন্ধানে সেটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(তিন) যয়ীফ হাদীসগুলোর দুর্বলতার ক্ষেত্রে স্তরভেদ রয়েছে। কাজেই গড়ে সবগুলোকে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করা যাবে না।

(চার) যয়ীফ হাদীস আর মওযু (জাল) হাদীস একই তালিকাভুক্ত নয়; বরং মওযু হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে যয়ীফ হাদীস ফাযায়েল, মুস্তাহাব আমল ও তারগীব–তারহীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফুকাহার মতে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ ও মুহাদ্দিসীনের একটি জামাত যয়ীফ হাদীস কবুল করে থাকেন। যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য বিস্তারিত আমরা দেখে এসেছি।

অথচ, পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনেকে ফাযায়েল বা তরগীব–তারহীব সংক্রান্ত কোন হাদীস সম্পর্কে যয়ীফ বা সমালোচিত শুনলেই অমনি তা উপেক্ষা করে বসেন। আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিসগণ যাঁরা সারা জীবন কোরআন হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস যাঁদের অন্তকরণে ছিল সংরক্ষিত। জীবনপণ সাধনা করে যাঁরা হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁদের সিদ্ধান্তকে আজ আমরা দু' একটি হাদীসের তরজমা দেখেই চ্যালেঞ্জ করে বসি। ভুলে যাই তাঁদের মাঝে আর আমাদের মাঝে তফাতের কথা।

সপ্তম উৎসঃ রিওয়ায়াতুল হাদীস বিল মা'নার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিসৃত হাদীসের হুবহু শব্দের প্রতি লক্ষ না রেখে শুধু তার ভাবার্থ বর্ণনা করা। এতে অনেক ক্ষেত্রে রাবী প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই এ জাতীয় বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জমহুর ওলামার মত হল, রাবীর আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত আরোপ করেছেন। বস্তুতঃ তা ইমাম সাহেবের বিচক্ষণতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শর্তটি হল, বর্ণনাকারীকে ফকীহ হতে হবে। ইমাম সাহেবের যুক্তি হল, অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সামান্য তফাতে অর্থের খুব একটা ভিন্নতা সৃষ্টি না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেক সময় এক একটি শব্দের উপর নির্ভর করে অনেক মাসআলার সমাধান, যা একমাত্র ফেকাহশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

বিষয়টিকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যার দ্বারা ইমাম আবু হানীফার (রঃ) বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের গভীরতাও কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

নাসায়ী শরীফে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার একটি বিশেষ

সময় নির্ধারিত ছিল। সে সময় আমি তার নিকট হাযির হয়ে অনুমতি চাইতাম। তখন তিনি নামাযে ব্যস্ত থাকলে গলায় কাশির শব্দ করতেন। আওয়াজ পেলে আমি প্রবেশ করতাম। আর ব্যস্ত না হলে সরাসরি অনুমতি দিতেন। এ হাদীসে কোন কোন বর্ণনাকারী (تنحنح) (গলায় কাশির শব্দ করা) এর স্থলে (سبح) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ তাসবীহ পাঠ করা।[১] এ শব্দ দু'টোর পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় ইমামদের পরস্পরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যেমন,

ইমাম আহমদ (রঃ)র মতে নামাযে রত আছে এ কথা বুঝানোর জন্য তাসবীহ পাঠ করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। গলায় কাশির শব্দ করলে তাঁদের মাযহাবের কারো কারো মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে আর পরবর্তী যুগের ওলামাদের মতে মাকরূহ হবে। (আল-মুগনী,১খঃ ৭০৬-৭০৭ পৃঃ, শরহু মুনতাহাল ইবাদাত ১খঃ ২০১ পৃঃ)

শাফেয়ী মাযহাব মতে, নামাযে তাসবীহ পাঠ করলে কোন অবস্থাতেই নামায ফাসেদ হবে না।[২] কিন্তু গলায় শব্দ করলে যদি দু'টি হরফ উচ্চারিত হয়ে যায় তবে শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশের ফতোয়া হল, নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।[৩]

১। সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২খঃ, ৫৪ পৃঃ,
২। আল-মাজমূ' ৪খঃ ২১ পৃঃ
৩। আল-মাজমূ' ৪খঃ, ১০ পৃঃ)

হানাফী মতে, তাসবীহ পাঠ করাতে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু বিনা ওজরে গলায় শব্দ করলে নামায ফাসেদ হবে। আর ওজর বশতঃ যেমন, তেলাওয়াতের জন্য গলা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে অথবা সে নামাজে আছে বলে কাউকে সতর্ক করার লক্ষ্যে গলায় শব্দ করলে নামায ফাসেদ হবে না। (আছারুল হাদীস ৩১ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

আর একটি দৃষ্টান্তঃ

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা নামাযে আসতে শান্তভাবে আসবে।

অতঃপর (ইমামের সাথে) যে কয় রাকাত পাবে পড়ে নিবে, আর যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নিবে।[১] অন্য রিওয়ায়েতে (فاتموا) (পুরা করে নিবে) এর স্থলে (فاقضوا) রয়েছে।[২]

১। বুখারী, হাদীস নং-৬৩৫
২। মুসনাদ আল হুমাইদী ২খঃ, ৪১৮ পৃঃ, হাদীস নং-৪১৮ মুসনাদ ইমাম আহমদ ২খঃ, ২৭০ পৃঃ

আর একটি বর্ণনাতে রয়েছে (وليقض ماسبقه) অর্থাৎ, যা ছুটে গিয়েছে তা কাযা করে নেবে। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-২খঃ ২৮৮ পৃঃ)

শব্দের এ সামান্য পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে হয়ত কোন গুরুত্ব পূর্ণ নয়। অথচ, শব্দ দু'টির উপর ভিত্তি করেই ফেকাহ শাস্ত্রে ইমামদের মাঝে বিরাট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কোন মুক্তাদী যদি চার রাক'আত নামাযের চতুর্থ রাকআতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয়, তবে ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর তার ছুটে যাওয়া তিন রাকআত কিভাবে আদায় করবে। প্রথম রেওয়ায়েত, অর্থাৎঃ (فاتموا) 'তোমরা অবশিষ্ট নামায পুর্ণ করে নেবে'-এর অর্থ দাঁড়ায়, মুক্তাদী যে রাকআত ইমামের সাথে আদায় করেছিল সেটা হল তার প্রথম রাকআত। ফলে ইমামের সালাম শেষে সে যখন ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াবে সেটা হবে তার দ্বিতীয় রাকআত। কাজেই তাতে 'ছানা' পাঠ করতে হবে না এবং এ রাকআত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। অবশিষ্ট দু' রাকআতে ছুরাও মিলাতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী' (রঃ) ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম এ ফতোয়াই দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত (فاقضوا) অর্থাৎ ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করে নেবে- অনুযায়ী ইমামের নামায শেষে যখন দাঁড়াবে সেটা হবে তার প্রথম রাকআত। কাজেই তাতে 'ছানা' পড়তে হবে এবং প্রথম দুই রাকআতে সুরায়ে ফাতেহার সাথে সুরা মিলাতে হবে। ইমাম আবু হানীফা প্রমূখ এ ফতোয়াই পেশ করেছেন। উপরন্তু তাঁরা অন্য রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে

বলেছেন, যেহেতু তার ইমামের সাথে আদায় করা রাক'আতটি ছিল প্রকৃত প্রথম রাক'আত কাজেই দাঁড়িয়ে আর এক রাকআত পড়ে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। এই হিসাবে উভয় রিওয়ায়েতের উপর তার আমল হয়ে যাবে।

মোটকথা, এ দু'টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, শব্দের সামান্য পার্থক্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থের তেমন একটা তফাৎ দৃষ্টিগোচর না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় আর সে জন্যই ইমাম আবু হানিফা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার জন্য রাবীর ফকীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তের উপর ভিত্তি করে যে সব রাবী ফকীহ নন এবং হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা সেগুলোকে দুর্বল ও অগ্রহণীয় বলে গণ্য করেছেন; যা অন্যান্য ইমামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও সহী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই বলে সেসব ইমামের কোন মন্তব্যের উপর নির্ভর করে ইমাম আবু হানীফার উপর এ অপবাদ রটানো কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, তিনি স্পষ্ট ও সহী হাদীসের পরিপন্থী মন্তব্য করেছেন এবং সহী হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন?

অষ্টম উৎসঃ হাদীস গ্রহণের জন্য আর একটি শর্ত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বাক্যগুলো কিভাবে উচ্চারণ করেছেন সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ, যের, যবর, পেশের কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা, আরবী ভাষার সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিরই অজনা নেই যে, আরবী ভাষা খুবই স্পর্শকাতর। যের-যবরের সামান্য পার্থক্যে বা কোন একটি শব্দ সামান্য দীর্ঘ করা না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দাঁড়ায়। যেমন, পবিত্র কোরআনে রয়েছেঃ

'আমি সেসব (মূর্তি) পূজা করি না যেগুলোর পূজা তোমরা করে থাক। এখানে যদি(لَآ أَعْبُدُ)শব্দটি দীর্ঘ না করে (لَأَعْبُدُ) পাঠ করা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে নিশ্চয়ই আমিও সেসব মূর্তির পূজা করি যেগুলোর তোমরা করে থাকো।.....নাউযুবিল্লাহ। কাজেই যদি এ জাতীয় পরস্পর বিরোধী অর্থের দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় তখনই সমস্যা দেখা দিবে এবং ফুকাহাদের মাঝে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে।

যেমন, শরীয়ত মুতাবেক কোন বকরী যবেহ করার পর তার উদর হতে যদি কোন বাচ্চা পাওয়া যায় তবে তার হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

এ হাদীসে দ্বিতীয় ذكاة শব্দটির শেষে যবর ও পেশ উভয় বর্ণনা রয়েছে। পেশের বর্ণনাটি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা অর্থ করেছেন ذكاة الجنين هي ذكاة امه উদরের বাচ্চা হালাল হওয়ার জন্য তার মাকে হালাল করাই (যবেহ করা) যথেষ্ট। কাজেই বাচ্চাটি নতুনভাবে যবেহ করতে হবে না। আর যাঁরা যবরের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অর্থ করেছেন, ذكاة الجنين هي كذكاة امه উদরের বাচ্চাটির হালাল করার পদ্ধতি তার মাকে হালাল করার মতই। অর্থাৎ, يذكى تذكية مثل ذكاة امه উদরের বাচ্চাটিকেও তার মাকে যেভাবে যবেহ করে হালাল করা হয়েছে সেভাবে যবেহ করে হালাল করতে হবে।

এ বর্ণনা অনুযায়ী যদি বাচ্চাটি জীবিত বের হয় তবে তাকে তার মার ন্যায় পৃথকভাবে যবেহ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রসিদ্ধ ও প্রথম রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন; আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইবেন হাযাম আল যাহেরী (রঃ) দ্বিতীয় রিওয়ায়েত অনুসারে ফতোয়া দিয়েছেন। (আল মুহাল্লা-৭খঃ, ৪১৯ পৃঃ)

চতুর্থ কারণঃ 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার মাঝেও ইমামদের মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কারও শর্ত খুবই কঠিন। কারও শর্ত অপেক্ষাকৃত (কিছুটা) নমনীয়। যেমন ইমাম আবু হানীফার যুগে কুফা শহরে জাল হাদীস রচনার প্রচলন খুব বেশী ছিল বলে তিনি হাদীস গ্রহণের বেলায় বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং তার শর্তগুলি ছিল কঠিন। এ ব্যাপারে কোন কোন ইমামের মত হল হাদীসটি কোরআন ও সুন্নাহর অপরাপর কোন দলীলের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে সেটা পরিহার্য। আর কোন কোন ইমামের মত হল, যদি কোন হাদীস শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী হয় তবে দেখতে হবে, হাদীসের রাবী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ কিনা। তিনি ফেকাহ শাস্ত্রবিদ হলে গ্রহণ করা হবে অন্যথায় নয়। শর্তের এই

মতপার্থক্যের ফলে একই সূত্রে বর্ণিত হাদীস একজনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যা অপরজনের দৃষ্টিতে বর্জনীয় বলে প্রমাণিত হবে। ফলে দ্বিতীয় জন বাধ্য হয়ে এ মাসআলার সমাধানে অন্যান্য যুক্তির আশ্রয় নিবেন। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হবে মতের ভিন্নতা।

পঞ্চম কারণঃ হাদীস বিস্মৃত হয়ে যাওয়াঃ

অর্থাৎ, মুজতাহিদের কোন মাসআলা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ জানার পর তাঁর স্মৃতিপট থেকে সে হাদীসটি বিস্মৃত হয়ে যায়। ফলে তিনি এ মাসআলার জবাবে হাদীসের নির্দেশ না পেয়ে অন্যান্য যুক্তির নিরিখে কিয়াস করতে বাধ্য হন। আর যেহেতু হাদীসটি তার মোটেই স্মরণে ছিল না। কাজেই এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য।

যেমন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)র নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল, সফরে গোসল ফরয হওয়ার পর পানি না পাওয়া গেলে কি করবে। হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন, পানি পাওয়া পর্যন্ত নামায মুলতবী রাখবে। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ হয় যে, একদিন আমরা উভয়ে একটি উটে আরোহী ছিলাম এবং আমাদের উভয়েরই (স্বপ্নদোষজনিত) গোসল ফরয হয়। অতঃপর পানি না পেয়ে আমি গোসলের তায়াম্মুম করার জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। আর আপনি নামায মুলতবী করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি দু'হাত জমিনের উপর মেরে চেহারা এবং হাত দু'টো মাস্‌হ্ করে বললেন, এতটুকু করলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন, আপনি যদি হুকুম করেন তবে আর কাউকে এ হাদীস শুনাতে যাব না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সে দায়দায়িত্ব তোমার নিজের। এ ঘটনা দ্বারা আমরা জানতে পরলাম–

তায়াম্মুম সংক্রান্ত হাদীসটি হযরত ওমর (রাঃ)র জানা ছিল, পরে ভুলে গিয়েছিলেন। (দুই) ফলে তিনি কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন যা সহী হাদীসের পরিপন্থী ছিল। (তিন) তাই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে মোটেই কল্পনা করা

যায় না যে, তিনি ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের খেলাফ ফতোয়া দিয়েছেন।

ষষ্ঠ কারণঃ হাদীসের সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মতপার্থক্যঃ

অনেক সময় হাদীসে ব্যবহৃত বাক্য সহজবোধ্য না হওয়ায় সবার পক্ষে হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব হয়নি। কেউ সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, কেউ তার বিপরীত বুঝেছেন, যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে–

১। হাদীসে বিরল ব্যবহৃত কোন শব্দ রয়েছে।

২। কোন শব্দ হাদীসে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মুজতাহিদ ইমামের এলাকাতে বা তার পরিভাষায় তা ভিন্ন অর্থে প্রচলিত রয়েছে। (আর একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমাদের বাংলা ভাষায়ও অনেক রয়েছে) কাজেই, তিনি নিজ এলাকার প্রচলিত অর্থেই ধরে নিয়েছেন। ফলে যিনি সঠিক অর্থের সন্ধান নিতে সক্ষম হয়েছেন তার সাথে এ ইমামের মতের অমিল দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআনে মদ্যপান নিষেধ করতে গিয়ে خمر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ শুধু 'আঙ্গুরের পাকানো রস'। এ অর্থের ভিত্তিতে অনেকে কোরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ خمر বলতে আঙ্গুরের পাকানো রসকেই বুঝেছেন। অথচ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, خمر বলতে মস্তিষ্ক আচ্ছন্নকারী প্রত্যেক দ্রব্যকেই বুঝানো হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

'মাতলামী আনয়ন করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই 'খামর' বলা হয়। আর মাতলামী আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।'। এছাড়া আরও বহু বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ মদ শুধু আঙ্গুরের রসেই সীমিত নয়।

৩। কুরআন ও হাদীসে অনেক শব্দ বা বাক্য রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা সকলের বোধগম্য হয়ে উঠেনি। ফলে কেউ কেউ তার শাব্দিক অর্থ ধরে নিয়েছেন। যেমন হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন, যখন আল্লাহ পাক হুকুম করলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

'আর তোমরা (রোযার রাতে) খাও এবং পান কর সাদা সূতা (সুবহে সাদেক) কালো সূতা (সুবহে কাযেব) থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত।'

তখন আমি সাদা ও কালো দু' রং এর দু'গাছি সূতা নিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিলাম এবং যতক্ষণ না ভোরের আলোতে সূতা দু'টির পার্থক্য পরিলক্ষিত হল, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিনি। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একাণ্ড শুনালে তিনি বললেন–

إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ

'তোমার বালিশটি তো বেশ বড়সড়।'

সংশ্লিষ্ট আয়াতটির অর্থ হচ্ছে; রাতের আঁধার হতে ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া

৪। আরবী ভাষার অনেক শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তার মধ্যে কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে ফুকাহাদের মাঝে মতের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে তিন قروء পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আর قروء শব্দটি ঋতু এবং দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। এখন এ আয়াতে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ণয়ের বেলায় সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু মূসা, উ'বাদাহ ইবনে সামেত, আবুদ্দারদা, ইবনে আব্বাস ও মু'য়ায ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) ঋতুর অর্থ নিয়েছেন। পক্ষান্তরে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর অর্থ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় নিয়েছেন। পরবর্তী ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রথম মত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (রঃ) দ্বিতীয় কওল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ) পরবর্তী পর্যায়ে নিজ মত পরিবর্তন করে প্রথম কওল গ্রহণ করেছেন।]

(আল্লামা ইবনে কায়্যিম কর্তৃক রচিত যাদুল মায়া'দ পৃষ্ঠা–৬০০–৬০১ পঞ্চম খণ্ড, মুয়াস্‌সাসাতুর–রিসালাহ বইরুত কর্তৃক ১৩ তম সংস্করণ)

প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমর্থনে কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন এবং একে অপরের যুক্তির জবাব পেশ করেছেন। আর এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত শেষের সময়সীমা নির্ধারণ। মহিলাটির অন্যত্র বিবাহ জায়েয হওয়া। তালাকে রেজয়ীপ্রাপ্তা মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার মীরাসের অধিকার ইত্যাদি বিষয়। যারা قروء অর্থ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় বলেছেন তাদের মতানুযায়ী তালাকের পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। মীরাসের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতানুযায়ী মহিলার তৃতীয় ঋতু শেষ হওয়ার পরই এসব হুকুম প্রযোজ্য হবে।

সপ্তম কারণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আমলের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে মতপার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ও শিক্ষা যেমন শরীয়তের দলিলরূপে বিবেচিত তদ্রূপ তাঁর আমলও শরীয়তের দলীলরূপে বিবেচিত। কাজেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথা থেকে যেমন দলীল গ্রহণ করতেন অনুরূপ তাঁর আমল দেখেও শীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না যে, তাঁর এ আমলটি সুন্নত, নফল বা ওয়াজিব কোন পর্যায়ের ছিল। নাকি এ আমলটি তার নিতান্ত অভ্যাসগত ছিল, যার সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। তখন সাহাবায়ে কেরাম আনুষঙ্গিক অন্যান্য যুক্তির নিরিখে তা সাব্যস্ত করতেন, যাতে বিষয়টির প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝেও দেখা দিত মতপার্থক্য। ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে সক্ষম হননি। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় আরাফার ময়দান থেকে ফেরার পথে আবতাহ (ওয়াদি মুহাস্‌সার) নামক স্থানে অবতরণ করেন। হযরত আবু হুরায়রাহ ও ইবনে ওমর (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবতরণ ইবাদত হিসেবে ছিল। কাজেই এখানে অবতরণ করা হজ্বের সুন্নতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, তার এ অবতরণ ঘটনাক্রমে ঘটেছিল। কাজেই এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবেই একই ঘটনা থেকে সাহাবা ও ফুকাহাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

অষ্টম কারণঃ পরস্পর বিরোধী একাধিক বর্ণনা বর্তমান থাকাঃ

অনেক সময় একই বিষয় সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটে তখন সে মাসআলার সমাধান এবং এ হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বেশ জটিল, যা ওলামাদের পরস্পরের মতপার্থক্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে প্রসংঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তের সকল হুকুম আহকামই যেহেতু একই উৎস থেকে নিসৃত কাজেই বাস্তবে শরীয়তের কোন হুকুমেই স্ববিরোধিতা নেই। অর্থাৎ, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, আল্লাহ ও রাসূল উম্মতকে একই মুহূর্তে পরস্পর বিরোধী দু'টি নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করছেনঃ

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

'আর যদি এ কোরআন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ হতে হত, তবে তাঁরা তাতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বিশদ আলোচনা করে জোরদারভাবে দাবী করেছেন যে, হাদীসে রসূলে স্ববিরোধ বা পরস্পর বিরোধী একাধিক হাদীস বলতে কিছুই নেই। সবগুলোর পিছনেই কোন না কোন যুক্তি রয়েছে। অথবা কোন সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা রয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম শাফেয়ী রচিত আল রিসালাহ–২১৬–২১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

এখন প্রশ্ন হল, যদি তাই হয় তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলীলের সামাবেশ ঘটার কারণ কি? জবাব হলঃ

(এক) অনেক সময় শরীয়ত কর্তৃক কোন একটি নির্দেশ দেয়ার পর অন্য নির্দেশ দ্বারা পূর্বের নির্দেশ রহিত করে দেয়া হয়। কিন্তু সাহাবীদের অনেকেই হয়ত নির্দেশ দু'টোর যে কোন একটি শুনেছেন। অপরটি শুনেননি। সুতরাং তিনি তাঁর শাগরিদদের সেটাই শুধু শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট উভয় হাদীসই সঠিক সূত্রে পৌছেছে, যার ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, শরীয়ত কর্তৃক পরস্পর বিরোধী দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তার মধ্যে একটি ছিল রহিত।

(দুই) অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে কোন নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার বিপরীত পরিস্থিতিতে ভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে অনেক শ্রোতা নির্দেশ দু'টির কোন একটি শুনেছেন কিন্তু সেটি যে বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ছিল এবং তার বিপরীত পরিস্থিতিতে ভিন্ন নির্দেশ রয়েছে তা তাঁরা জানতে সক্ষম হননি আর এভাবেই তাঁরা পরবর্তীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছন। ফলে পরবর্তীদের দৃষ্টিতে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ, বাস্তবে তাতে কোন বিরোধ নেই।

(তিন) অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ প্রশ্নের জবাবে কোন হাদীস বলেছেন, যার সঠিক মর্ম বুঝা অনেক সময় নির্ভর করে প্রশ্নটি সম্পর্কে জানার উপর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয়ত অনেকে জবাবটি সংগ্রহ করেছেন, প্রশ্নটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্নসহ বিস্তারিত যারা বর্ণনা করেছেন তাঁদের সাথে এঁদের বর্ণনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। অথচ, বাস্তবে তার মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই।

(চার) অনেক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই 'আমল' দেখে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধারণা করেছেন। যেমন, আবু দাউদে সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের নিয়ত করার সময় উচ্চস্বরে যে তালবিয়া পাঠ করেছিলেন তার সময় নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের

মাঝে মতপার্থক্য বিস্ময়কর নয় কি? জবাবে তিনি বললেন, ব্যাপারটি আমি ভালভাবেই জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে হজ্ব একটিই করেছিলেন। কাজেই হজ্বের এহরামও জীবনে একবারই করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ মতপার্থক্যের কারণ ছিল, তিনি যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মসজিদে যিল-হুলাইফাতে পৌছে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন তখন হজ্বের নিয়ত করলেন এবং উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর উটের উপর বসে পূনরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। অনুরূপ 'বায়দা' নামক এলাকার উচুঁতে যখন চড়লেন তখন পুনরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু একসাথে এবং একই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতেন না; বরং একের পর এক দলে দলে উপস্থিত হতেন, ফলে যিনি উক্ত তিন সময়ের যে সময় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছেন তিনি সে সময়ের কথাই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাযে বসেই হজ্বের নিয়ত করেছিলেন। অতঃপর উষ্ট্রীতে বসে যখন চলতে আরম্ভ করলেন তখন পুনরায় তালবিয়া পড়েছেন। অনুরূপ, বায়দা নামক স্থানের উচুঁ স্থানে চড়েও পাঠ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ

এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হজ্বের ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবাদের এ মতপার্থক্যের কারণ কি? শুধু তাই নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবীও করেছেন। এর জবাবে কাযী আইয়ায বলেনঃ

এ জাতীয় পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন কেরাম বেশ লেখালেখি করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন আবু জা'ফর আল তাহাবী। তিনি এ বিষয়ে এক হাজারের বেশী পৃষ্ঠা লিখেছেন। আরও আলোচনা করেছেন আবু জাফর তাবারী, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সুফ্রাহ, আল-মুহাল্লাব, কাজী আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুরাবেত, কাজী আবু হাসান ইবনুল ক্বাস্সার আল বাগদাদী ও হাফেয ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ।

কাজী আইয়ায আরও বলেন, তবে তাদের সকলের বক্তব্যগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ ব্যাপারে সবচে'

বাস্তবানুগ ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মন্তব্য হল যে, লোকদের জন্য (এহরামের ব্যাপারে) এই তিন পদ্ধতির সবগুলোরই অনুমতি দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সবগুলোই জায়েয বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, যদি কোন একটি পদ্ধতির নির্দেশ দিতেন, তবে অপরাপর পদ্ধতিগুলা না জায়েয বলে ধারণা হত।

মোটকথা, বিভিন্ন কারণে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী একাধিক বর্ণনার সমাবেশ ঘটেছে, যার কারণে এ গুলোর মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে এবং এর সার্বিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ওলামাদের পরস্পরে মাতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কাজেই পরস্পরবিরোধী এ বর্ণনাগুলোও ইমামদের মতপার্থক্যের অন্যতম একটি কারণ।১

১। তবে ওলামায়ে কেরাম এসব বর্ণনার পিছনে সীমাহীন মেহনত ও সাধনা করেছেন। অনেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন,

(এক) اختلاف الحديث রচনা করেছন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। কিতাবটিতে তিনি আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন হাদীস পেশ করে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বাস্তব ক্ষেত্রে এর মাঝে কোনই বিরোধ নেই।

(দুই) شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الاحكام এ মহাগ্রন্থ চার খণ্ডে সমাপ্ত। রচনা করেছেন, ইমাম আবু জাফর আল তাহাবী (রঃ) তাতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে স্ববিরোধী রিওয়ায়েত ও দলীলগুলো একত্র করে পরিশেষে হানাফী মাযহাবের যুক্তি ও দলীল তুলে ধরেছেন এবং স্ববিরোধী দলীলগুলোর সুরাহা করেছেন বেশ নিপূণতার সাথে।

(তিন) مشكل الاثار এটাও আবু জাফর তাহাবী রচিত। এটা চারখণ্ডে সমাপ্ত। এতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করে তাতে উদ্ভাবিত প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। সেই সাথে হাদীসটি যদি অন্য কোন রিওয়ায়াত বা কোরআনের আয়াতের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ মনে হয়, তারও সুরাহা করেছেন। তাঁর এ অনন্য গ্রন্থ দু'টো হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের জন্য খুবই ফলপ্রসূ।

(চার) تهذيب الاثار এটা ইবনে জারীর আল তাবারীর রচিত একটি অমূল্য কিতাব। এ কিতাবটি প্রথমতঃ তিনি সমাপ্ত করার পূর্বেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ রচিত সব কয়টি খণ্ড সংগ্রহ করতে পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম সক্ষম হননি। তাতে তিনি

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহসহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন সাহাবীর স্বতন্ত্র 'মুসনাদ' তৈরী করেছেন, তার মধ্যে মাত্র হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাসের তিনটি মুসনাদ ছাপা হয়েছে। কিতাবটি সম্পর্কে আলহাজ্ব খলীফা যথার্থই বলেছেন, 'এ বিষয়ে, এ বর্ণনা ভঙ্গিতে এমন বিশদভাবে তার মত আলোচনা আর কেউ করেননি।'

খতীব বাগদাদী বলেন, 'এ বিষয়ে তাঁর এ কিতাবটির মত অন্য কোন কিতাব আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।'

আল্লামা ইয়াকূত আল হামাওয়ী বলেনঃ 'এটা এমন অনন্য কিতাব, যার তুলনা পেশ করা ওলামাদের পক্ষে দুষ্করই বটে। তদ্রূপ এ (অসমাপ্ত কিতাবটি) সমাপ্ত করাও তাদের জন্য সুকঠিন।'

ফুকাহায়ে কেরাম 'আপাত' পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর সমাধানে তিনিটি পন্থা অবলম্বন করেছেন।

১। এমন পন্থা অবলম্বন করা যাতে এক সাথে উভয়টির উপর আমল হয়ে যায়।

২। কোন একটিকে 'মানসূখ' (রহিত) প্রমাণ করা।

৩। কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

অনেকে দ্বিতীয় পন্থার আগে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, তাদের ধারাক্রম এই, প্রথমে উভয়টির উপর আমল করার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে সর্বশেষ কোন একটিকে 'মানসূখ' বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। ধারাক্রমের ক্ষেত্রে এই মতভিন্নতার ফলেও অনেক ক্ষেত্রে ফতোয়ার সমাধানে মতের ভিন্নতা দেখা দিবে। মোটকথা, ফুকাহায়ে কেরাম প্রথমতঃ এমন কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন যাতে একসাথে উভয়টির উপর আমল হয়ে যায়।

আর পরস্পর বিরোধী দু'টি বর্ণনার মাঝে সমতা বজায় রেখে উভয়টির উপর আমলের চেষ্টা করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়; বরং তা নির্ভর করে কঠিন সাধনা এবং গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর। আর যেহেতু সকলের জ্ঞানের তীক্ষ্ণতার পরিমাণ সমপর্যায়ের নয়। কাজেই, কেউ হয়ত এ পন্থায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে সৃষ্টি

হয়েছে মতের ভিন্নতা।

দ্বিতীয় পন্থাঃ

সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেও প্রথম পন্থা গ্রহণে সক্ষম না হলে ফুকাহাগণ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, কোন একটি বর্ণনাকে 'মনসূখ' তথা রহিত প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য তাঁরা ক্রমান্বয়ে চারটি প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেনঃ

(এক) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেনঃ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

'আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন তা রহিত করে দিলাম। কাজেই) এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।

(দুই) কোন সাহাবীর বক্তব্য। যেমন, তিরমিযি শরীফে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔

'অগ্নি স্পর্শ করেছে এমন কিছু খেলে অযু করে নিবে।' এ জাতীয় আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, (আগুনে) রান্না করা কিছু খেলে তাতে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রান্না করা জিনিস খেয়ে পুনঃ অযু না করেই নামায পড়েছেন।

ফলে হাদীসগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়েছে, যার সমাধান করা হয়েছে সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর বক্তব্য দ্বারা। তিনি বলেন–

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

'অগ্নি স্পর্শ করা কিছু খেয়ে অযু না করাই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের আমল।'

ইমাম সিনধী বলেনঃ

'এ সাহাবীর বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, প্রথম বর্ণনাটি 'মানুসূখ'। এ হাদীস না পাওয়া গেলে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী ছিল।১

১। (হাশিয়াতুল ইমাম আল সানাদী আনুনাসায়ী–১খঃ, ১০৮–১০৯ পৃঃ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য شرح معاني الآثار ৬২–৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(তিন) অনেক সময় দু'টি হাদীসের বর্ণনাকাল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ হাদীস আগে এবং কোনটি পরে বলেছেন। তাতেও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রথমটি 'মানসূখ'।

যেমন, শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন তিনি কোন এক ব্যক্তিকে সিঙ্গা লাগাতে দেখে বললেনঃ

افطر الحاجم والمحجوم

যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে যাবে।

অন্য হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم محرمًا صائمًا

'অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন।'

উল্লেখিত হাদীস দ্বয়ের প্রথমটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সিঙ্গা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, রোযা ভঙ্গ হয় না। ফলে হাদীস দুটো

পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। এর সমাধান হল যে, প্রথম বর্ণনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের বছরের। অর্থাৎ, অষ্টম হিজরীর। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহরাম অবস্থার। আর তিনি এহরাম বিদায়ী হজ্বের বছরই করেছিলেন এবং বিদায়ী হজ্ব হয়েছিল দশম হিজরীতে। কাজেই, বুঝা গেল যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি পরের, যার দ্বারা প্রথমটিকে 'মানসূখ' করে দেয়া হয়েছে।

অনেক সময় আনুষঙ্গিক বিভিন্ন (قرائن) প্রমাণ দ্বারাও কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, হাদীস দু'টির বর্ণনাকারী সাহাবীদ্বয় বেশ আগে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং প্রথমে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসটি ইসলাম গ্রহণ করার পর পরই শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। অপরপক্ষে দ্বিতীয়জনও তার হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে দাবী করেছেন। কাজেই জানা গেল যে, প্রথম জনের হাদীসটি পূর্বের হুকুম ছিল যা দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারা 'মানুসূখ' হয়ে গিয়েছে।

(চার) চতুর্থ প্রমাণ হল, উভয় হাদীসের কোন একটির উপর যদি এমন 'ইজমা' তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এতেও প্রতীয়মান হবে যে, অপর হাদীসটি 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একেবারে কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি এ দাবী (প্রমাণিত) করা সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয় পন্থাঃ

'মানসূখ'ও প্রমাণিত করা সম্ভব না হলে ফুকাহয়ে কেরাম তৃতীয় পন্থা– অর্থাৎ, উভয় বর্ণনার কোন একটিকে 'তারজীহ' বা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর এ পন্থাটি সর্বাধিক কঠিন। কেননা, এতে যেমন হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে তদ্রুপ প্রয়োজন হবে হাদীসগুলোর পটভূমি, রাবীদের ইতিহাস, গুণাবলী ইত্যাদির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বিচার বিশ্লেষণ করা। তবেই কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হবে।

'তারজীহ' দেয়ার জন্য তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। আল্লামা হাসেমী (রঃ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار গ্রন্থে পঞ্চাশটি পদ্ধতি লিখে পরিশেষে বলেছেন, এ ছাড়া আরও অনেক

পদ্ধতি আছে যা কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করিনি।১

১। আর হাফেয ইরাকী حاشيتعلي ابن الصلاح গ্রন্থে 'তারজীহ' দেয়ার পদ্ধতি ১১০ পর্যন্ত লিখেছেন। অতঃপর বলেছেন, এ ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার সবগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

নবম কারণঃ কোন বিষয়ে কোরআন ও হদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধানের অনুপস্থিতিঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর বেশ কিছু নব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে ও ঘটছে যা তাঁর যুগে ঘটেনি। ফলে তাঁর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রত্যক্ষ কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম কোরআন ও হাদীসের অপরাপর আহকামের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে অথবা আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে নব উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। আর তখনই তাঁদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেখুন–

প্রথমদৃষ্টান্তঃ

কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরসুরীদের মধ্যে ভাই এর উপস্থিতিতে দাদার মীরাসের অধিকার সংক্রান্ত মাসআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পেশ হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবাদের সামনে পেশ হয়েছে। ফলে এর সমাধানে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) তার সুরাহা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন–

'লোকসকল! আমার বাসনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তিনটি বিষয়ের যদি সমাধান করে যেতেন, আমরা তা মেনে নিতাম এবং আমরা আজ এ সমস্যায় পড়তাম না। বিষয় তিনটি হল, ১। 'কালালা'– অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পিতা বা সন্তানের কেউ নেই। ২। দাদার মীরাস সংক্রান্ত মাসআলা। ৩। সুদ সংক্রান্ত কয়েকটি

বিষয়।

মোটকথা, দাদার মীরাসের ব্যাপারে হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধান না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, মুয়া'য ইবনে জাবাল, আবু মূসা আশআরী, আবু হুরায়রাহ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের মতে, দাদা যেহেতু ভাইদের তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম। কেননা, তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য পিতৃতুল্য। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে দাদাকে পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন,

'তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের (আঃ) মিল্লাত বা ধর্ম'। কাজেই দাদা, ভাইদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা মীরাসের অংশীদার হবে না। (হযরত ওমর (রাঃ)ও প্রথম দিকে এ মতই পোষণ করেছিলেন, পরে তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেন।)

অপরপক্ষে হযরত আলী, ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)র মতে, মৃত ব্যক্তির নৈকট্যের ব্যাপারে দাদা ভাই উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী। কেননা, উভয়ের সাথেই তার সম্পর্কের সূত্র হল পিতা। কাজেই দাদা ও ভাই উভয়েই মীরাসের অংশীদার হবে।

সাহাবায়ে কেরামের এ মতপার্থক্যের ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে পারেননি। যেমন, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম, ইমাম আহমদের মতামত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত হল, এ ক্ষেত্রে দাদাও মিরাস পাবে। তবে মিরাস বন্টনের বেলায় তাদের পরস্পরে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ ও দাউদ (রঃ) প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, দাদা মীরাস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ

হযরত ওমরের (রাঃ) যুগে একটি নতুন মাসআলা পেশ হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ হল, ইয়ামানের রাজধানী সানআ'তে জনৈক মহিলার স্বামী তার অন্য

পক্ষের একটি সন্তানকে আমানত রেখে কোথাও সফরে যায়। স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে। সৎসন্তানের কারণে অপমানিত হতে হয় কিনা সে ভয়ে মহিলাটি তার অবৈধ প্রেমিককে প্ররোচিত করে তার এক দাস ও অন্য আর এক ব্যক্তিসহ সকলে মিলে ছেলেটিকে হত্যা করে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে চামড়ার থলেতে করে একটি পরিত্যাক্ত কূপে ফেলে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে সকলেই অপরাধ স্বীকার করে। অত্র এলাকার প্রশাসক ব্যাপারটি হযরত ওমরের (রাঃ) কাছে লিখে পাঠালেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাদের সকলকেই হত্যা করার নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, সানআ'বাসীদের সকলেও যদি তার হত্যায় অংশগ্রহণ করত আমি অবশ্যই তাদের সকলকে এর কিসাসে হত্যা করতাম।

এ সিদ্ধান্তে হযরত আলী, মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমরের সাথে একমত ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত যায়ীদ ইবনে মুসায়্যাব, আল হাসান, আ'তা ও কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ এ মত গ্রহণ করেছেন। আর এটাই হল ইমাম মালেক, সাওরী, আওযায়ী', শাফেয়ী, ইসহাক্ব, আবু সাওর ও 'আসহাবুর রায়' সম্প্রদায়ের মাযহাব।

অপরপক্ষে ইবনুয্যুবায়রের সিদ্ধান্ত ছিল- দিয়ত নেয়া। পরবর্তীদের মধ্যে আল-যুহরী; ইবনে সীরীন, 'রাবীয়াতুর রায়, দাউদ, ইবনুল মুনযিরের মতও তাই ছিল। ইমাম আহমদ থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে।

তাঁদের মতভিন্নতার কারণ হল, একাধিক ব্যক্তি মিলে কাউকে হত্যা করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি। ফলে এর কোন সমাধান প্রত্যক্ষভাবে কোরআনে বা হাদীসে নেই।

কোন ইমামের সহী হাদীস পরিপন্থী ফতোয়াঃ

আশাকরি উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। ১। একই উৎস কোরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ফিকাহ শাস্ত্রে ইমামদের পরস্পরের মতপার্থক্যের কারণ ও উৎসগুলো কি কি? ২। অনেক সময় কোন কোন ইমামের ফতোয়া 'সহীহ' হাদীসের পরিপন্থী পরিলক্ষিত হয় কেন?

এবার আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ

বিষয়টিও অনেক সময় সাধারণের মনে বেশ দ্বিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অনেক সময় কোন কোন আলেম সম্প্রদায়ের মাঝেও বেশ জটিলতা ও বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি হল, অনেক সময় দেখা যায় যে, সহী বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহ্ সিত্তার কোন কিতাবে অথবা অন্য কোন 'সহীহ্' হাদীস গ্রন্থে এমন স্পষ্ট ও সহী হাদীস দৃষ্টিগোচর হয় যা ইমামের ফতোয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একাদকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উপেক্ষা করা, বিন্দুমাত্র ঈমান যার অন্তরে আছে তার পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে অনুসরণীয় ইমামের ফতোয়াও তো নিশ্চয়ই কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক কোন না কোন দলীলের উপর নির্ভর করেই উৎসারিত। কাজেই, দ্বিমুখী পথের কোনটি অবলম্বন করা উচিত। এর জবাব হল, আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, শরীয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল কোরআন ও হাদীস, যা মুমিন মাত্রই নিঃসংকোচে মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য। কাজেই কোন ইমাম বা মুফতীর কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে আমরা বিশদভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসুরী ইমামদের সর্বসম্মত মতামত ও আমল পেশ করে এসেছি। প্রত্যেক ইমামেরই বক্তব্য ছিল যে, আমার পরিবেশিত কোন ফতোয়ার পরিপন্থী যখনই কোন হাদীস 'সহীহ্' বলে প্রমাণিত হবে তখন আমার বক্তব্য বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে হাদীসকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেবে। আর সেটাই হবে আমার মাযহাব।

তবে তা বিনা শর্তে নয়; বরং এই শর্তে যে, প্রথমতঃ হাদীসটি সত্যিই 'সহীহ' কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ইমাম সাহেব সংশ্লিষ্ট হাদীসটির প্রতিকূল ফতোয়া পেশ করলেন কেন? তিনি কি হাদীসটি সম্পর্কে আদৌ অবগত ছিলেন না; নাকি তিনি জেনেশুনে অন্য কোন প্রবল যুক্তির ভিত্তিতে অথবা এ হাদীসটি রহিত বলে প্রমাণিত হওয়ার কারণে এড়িয়ে গেছেন? তাও ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সেই সাথে এ সব বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা, হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান, ইমাম সাহেবের সকল কিতাবাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে সবার আগে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য পূর্বসুরী ও আকাবিরদের বিভিন্ন বক্তব্য ও আমল পেশ করছি।

আল্লামা ইবনুশ্‌শিহ্‌নাহ্ আল কাবীর আল হালাবী আল হানাফী শায়খুল কামাল ইবনুল হুমাম (রঃ) লিখেছেন–

যদি মাযহাবের পরিপন্থী কোন হাদীস পাওয়া যায় এবং তা 'সহীহ' বলে প্রমাণিত হয় তবে হাদীসটির উপরই আমল করতে হবে। আর সেটা তার নিজস্ব মাযহাব বলে বিবেচিত হবে এবং এ বিশেষ ক্ষেত্রে মাযহাবের ফতোয়া ত্যাগ করা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে তাকে হানাফী বলেই গণ্য করা হবে। কেননা, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন, যদি কোন বিষয়ে আমার ফতোয়ার পরিপন্থী কোন হাদীস 'সহীহ্' বলে প্রমাণিত হয় তবে সেটাই হবে আমার মায্‌হাব। ইবনে আব্দুল বার ইমাম আবু হানীফা প্রমুখ থেকে এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আ'বেদীন উপরোক্ত উক্তি উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ

ইমাম শা'রাণী ইমাম চতুষ্টয় থেকেও উপরোক্ত মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সহী হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমামের ফতোয়া রদ করা তারই পক্ষে সম্ভব, যে কোরআন হাদীস পর্যালোচনা করার সামর্থ্য রাখে এবং কোরআন ও হাদীসের 'মুহকাম' (বহাল হুকুম) আর 'মানসূখ' (রহিত হুকুমের) মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা যার রয়েছে। মোটকথা, যখন কোন মাযহাবপন্থী (মুকাল্লিদ) কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল পর্যালোচনা করে আমল করবে তা মাযহাবের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মাযহাবের অনুসারী বলে অভিহিত করা হবে। কেননা, তার এ পদক্ষেপ– অর্থাৎ, মাযহাবের মতামত ত্যাগ করে 'সহীহ' হাদীস গ্রহণ করা মাযহাব কর্তৃক অনুমোদনক্রমেই ছিল। কেননা, তার ইমাম যদি স্বীয় দলীলের দুর্বলতা সম্পর্কে অবিহিত হতেন তবে অবশ্যই তিনি তাঁর এ দুর্বল দলীল উপেক্ষা করে সবল দলীলটিই গ্রহণ করতেন।

ইবনে আবেদীন তাঁর রচিত 'শারহু রাসমিল মুফতী' নামক কিতাবেও একই প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি আরও লিখেছেনঃ

কোন সহী হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাবের মতামত প্রত্যাখ্যান করার জন্য আর একটি শর্ত হল, উক্ত হাদীসটির অনুকূলে কোন না কোন মাযহাবের মতামত থাকতে হবে। কেননা, সকল মাযহাবের পরিপন্থী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইজতিহাদের অনুমতি কেউ দেননি। কারণ, পূর্বের ইমামদের ইজতিহাদ তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। কাজেই বলাবাহুল্য, তার দলিলের চেয়েও প্রবল কোন দলিল তাঁদের নিকট ছিল, যার ভিত্তিতে তাঁরা এ হাদীসের উপর আমল করেননি।

আল্লামা আব্দুল গাফ্‌ফার (রঃ) তাঁর রচিত 'দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কি্বরাআতি খাল্‌ফাল ইমাম' নামক কিতাবে ইবনে আবেদীনের উল্লেখিত মন্তব্যের সমর্থনে লিখেছেনঃ

তার এ শর্তগুলো খুবই সঙ্গত। কেননা, সাম্প্রতিককালে আমরা অনেক অহংকারী তথাকথিত আলেমকে দেখি, নিজেকে তিনি সুরাইয়া তারকা মনে করেন। অথচ, তার স্থান মাটির অতলতলে। হয়ত অনেক সময় তিনি 'সিহাহ্ সিত্তার' কোন একটি হাদীসগ্রন্থে হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী কোন 'সহীহ' হাদীস পেয়েই বলে বসবেন, আবু হানীফার মাযহাবকে দেয়ালে নিক্ষেপ কর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ কর। অথচ, এমনও হতে পারে যে, হাদীসটি মানসূখ অথবা অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ অথবা হাদীসটির যুক্তিসংগত কোন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু তার সে ব্যাপারে আদৌ জানা নেই। এমন লোকদের প্রতি যদি ফতোয়ার দায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং তাদের কাছে যারা শিখতে আসবে তাদেরকেও গোমরাহ করে ছাড়বে।

অনুরূপ, শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববী (রঃ) ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের অসাধারণ বুৎপত্তির কথা উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

বস্তুতঃ স্পষ্ট ও 'সহীহ' হাদীসের পরিপন্থী মতামতকে উপেক্ষা করা আর হাদীসকে গ্রহণ করার যে অসীয়ত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে তা তিনি সতর্কতার লক্ষ্যে বলেছিলেন। কেননা, কোন মানুষের পক্ষে সকল হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর আমাদের ইমামগণ তার এ অসীয়ত যথাযথ পালন করেছেন এবং (مسألةالتثويب) ফজরের আযানের পর নামাযের জন্য পুনরায় ডাকা এবং হজ্বের মধ্যে হালাল হওয়ার জন্য অসুস্থতা ইত্যাদির শর্তারোপ করা; প্রভৃতি বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ মাসআলাগুলোতে এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু এর জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা এ যুগের খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সে সব শর্ত আমি 'শারহুল-মুহায্যাব' কিতাবের ভূমিকাতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

ইমাম নববী (রঃ)আলোচিত শর্তগুলো সংক্ষেপে আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ)র উল্লেখিত বক্তব্যের এ অর্থ নয় যে, তাঁর ফতোয়ার পরিপন্থী কোন হাদীস পেয়ে এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব বলে তার বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা আরম্ভ করে দিবে। বরং ইজতিহাদ-ফিল-মাযহাবের যোগ্যতা ব্যতিরেকে কারো পক্ষে এ দবী করা বা এ পন্থা অবলম্বন করার অধিকার নেই। সেই সাথে তাকে প্রথমেই যথাসম্ভব নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর অবগতিতে ছিল না। অথবা হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সক্ষম হননি। আর ইমাম সাহেবের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁর এবং তাঁর শাগরিদদের রচিত সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন করার পরই সম্ভব হবে। যা দুষ্করই বটে। খুব কম লোকই সে পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে।

এ শর্তারোপের কারণ হল, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) অনেক হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে তার যাহেরী অর্থের উপর আমল করেননি। যেমন, ১। হাদীসটির বিরূপ সমালোচনা ছিল। ২। 'মানসূখ' ছিল। ৩। তার বিশেষ কোন অর্থ ছিল। ৪। অন্য কোন ব্যাখ্যা তিনি করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম নববী (রঃ) ছিলেন সপ্তম শতাব্দির। যে শতাব্দির প্রথম দিকে ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী, ইবনে সালাহ, আল মুনযিরী, আল 'ইয্ ইবনে আব্দুস সালাম, ইবনে মুনীর, আবুল হাসান ইবনে ক্বাত্তান, আল মুওয়াফ্ফিক ইবেন ক্বুদামাহ প্রমুখ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ইমামগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের ব্যাপারেই ইমাম নববী (রঃ) মন্তব্য করছেন যে, মাযহাবের মত ত্যাগ করে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করার মত সামর্থ্য এ যুগে খুব কম লোকের মধ্যেই রয়েছে। তা হলে বুঝে নিন ইলমের এ দৈন্যের যুগে অবস্থা কি হতে পারে!

ইমাম শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আল ক্বারাফী আল-মালেকী (রঃ) তার রচিত 'আত্তানকীহ' নামক কিতাবে লিখেন-

শাফেয়ী মাযহাবের অনেক ফিকাহবিদ ইমাম শফেয়ীর (রঃ) এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলে বসেন, এ ব্যাপারে অমুক হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। তাদের এ পন্থা নিছক ভুল। কেননা, কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য শুধু 'সহীহ বলে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে হাদীসটির পরিপন্থী কোন প্রবল প্রমাণ না থাকাও জরুরী হবে। আর কোন হাদীসের পরিপন্থী দলিল নেই বলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শরীয়তের সকল বিষয়ের সার্বিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া। তবেই তার সে মন্তব্য যথাযথ হবে। আর পূর্ণাংগ 'মুজতাহিদ' ব্যতীত অন্য কারও পর্যালোচনার কোন গুরুত্ব নেই। কাজেই এ পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে সে যোগ্যতা অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য।

ইমামদের এ বিস্তারিত আলোচনা শুনার পর নিশ্চয়ই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন সহীহ হাদীস পাওয়া মাত্রই তার উপর আমল শুরু করে দেয়া ঠিক নয়; বরং তার জন্য অগ্র-পশ্চাৎ কিছু শর্ত রয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমলের দিকে আগে বাড়তে হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন অসাধারণ যোগ্যতা। কাজেই অযোগ্যদের জন্য সুযোগ্য ইমামের শরণাপন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে যে, তারা তো বলেছেন, আমার বক্তব্যের পরিপন্থী কোন 'সহীহ' হাদীস পরিদৃষ্ট হলে হাদীসের উপরই আমল করবে এবং সেটাই হবে আমার মাযহাব- এর কি অর্থ? এর জবাবে আল্লামা হাবীব আহমদ আল কীরানূভী বলেন-

ইমামদের এসব বক্তব্যের অর্থ হল, প্রকৃত সত্যের প্রকাশ করে দেয়া যে, প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যই হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য দলিল। কাজেই আমার বক্তব্যকে স্বতন্ত্রভাবে দলিলরূপে ধারণা করো না। আর আমি অজ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বললে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু সে জন্য এ কথা জরুরী নয় যে, কোন হাদীস 'সহীহ' বলে প্রমাণিত হওয়া মাত্রই সেটা ইমাম সাহেবের মাযহাব বলে বিবেচিত হবে।

কেননা, অনেক হাদীসই সহীহ বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও ইমামগণ

জেনেশুনে বিভিন্ন যুক্তির ভিত্তিতে তা পরিহার করেছেন। যেমন, হযরত ইব্রাহীম আল-নাসায়ী বলেন-

আমি কোন হাদীস শোনার পর লক্ষ্য করে দেখি; যেগুলো গ্রহণযোগ্য, সেগুলো গ্রহণ করি। বাকি সব ছেড়ে দেই।

আল-কাজী আল-মুজতাহিদ ইবনে আবু লাইলা (রঃ) বলেন-

কোন মানুষ হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে ততক্ষণ পর্যন্ত সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যগুলো গ্রহণ করবে আর বাকিগুলো ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রঃ) বলেন-

কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না হাদীসের প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য এবং ইল্‌মের উৎসগুলো জানতে সক্ষম হবে এবং যে কোন হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা থেকে বিরত না হবে, সে ইমাম হতে সক্ষম হবে না।

ইবনে ওয়াহাব (রঃ) বলেন-

আল্লাহ পাক যদি আমাকে ইমাম মালেক ও ইমাম লাইসের উছিলায় হিফাযত না করতেন তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিভাবে? জবাবে তিনি বললেন-

আমি প্রচুর পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করেছিলাম। ফলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ি। অতঃপর সেসব হাদীস ইমাম মালেক ও ইমাম লাইসের সম্মুখে পেশ করি; তখন তাঁরা বলে দেন, এই হাদীসটি গ্রহণ করো আর এই হাদীসটি ছেড়ে দাও।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, একবার ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইবনে উয়াইনাহ'র নিকট ইমাম যুহরীর বর্ণিত অনেক হাদীস সংগৃহীত রয়েছে যা আপনার নিকট নেই। জবাবে ইমাম মালেক (রঃ) বললেন-

আমি যে সব হাদীস সংগ্রহ করেছি, সবই কি আর বর্ণনা করি নাকি? যদি তাই করতাম তবে তাদেরকে গোমরাহ করে ছাড়তাম।

এ সব বক্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন হাদীস পাওয়া মাত্রই কোন প্রকার আলোচনা পর্যালোচনা ব্যতিরেকে তার উপর আমল শুরু করে দেয়া যাবে

না। আর ফুকাহায়ে কেরাম তা করেনওনি। কেননা, পূর্বেই বলে এসেছি যে, অনেক হাদীস বিভিন্ন যুক্তির নিরিখে 'মানসূখ' বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, সে হাদীসগুলো 'সহীহ' ও সবল সনদে বর্ণিত। যেমন, 'সহীহ' মুসলিমে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ

অপরপক্ষে 'সহীহ' বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস, আমর ইবনে উমাইয়া আয্‌যামবী ও উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি হাড় (থেকে কিছু গোস্ত) খেলেন। কোন কোন বর্ণনাতে রয়েছে বকরীর কাঁধের অংশের গোস্ত খেলেন এবং কোন প্রকার পানি স্পর্শ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করলেন।

এ রিওয়ায়েতটি মুসলিম শরীফেও রয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত ইবেন আব্বাস থেকে আরো একটি রিওয়ায়েত রয়েছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামাযের জন্য বের হয়েছেন এমন সময় তার জন্য রুটি আর গোস্ত হাদীয়া স্বরূপ পেশ করা হল। তিনি তা থেকে তিন লোক্‌মা খেলেন এবং পানি স্পর্শ করেননি।

উল্লেখিত হাদীস দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী আর উভয়টিই নির্ভরযোগ্য 'সনদে' বর্ণিত। এখন যদি কোন ব্যক্তি যে কোন একটি হাদীস দেখেই 'সহীহ' বলে আমল শুরু করে দেয় আর জোর গলায় মন্তব্য করে যে, আমি বুখারী শরীফে হাদীসটি পেয়েছি। তবে কি তার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে? অথচ হাদীস দু'টিই তো সহীহ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। কাজেই বুঝা গেল যে, কোন একটি মাত্র সহী হাদীসের উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; বরং তার সাথে সম্পর্কিত অপরাপর হাদীস বা দলিল সমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুরূপ, সে হাদীসটি অন্য কোন যুক্তির মাধ্যমে 'মানসূখ' হয়েছে কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। আর এ বিচার বিশ্লেষণ যেহেতু সাধারণ ব্যাপার নয় কাজেই ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, যাঁরা 'সনদ' ব্যাখ্যা ও পটভূমি সহ লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন, সেই সাথে পবিত্র কোরআনের

ব্যাখ্যা ও পটভূমি সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং একসাথে কোরআন ও হাদীসের সকল দলিল সামনে রেখে 'ফেকাহ শাস্ত্র' প্রণয়ন করেছেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি আমাকে কোন একটি বিষয়ে 'সহীহ' বুখারীর একটি হাদীস পেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন (হানাফী মাযহাবের ফতোয়া সে হাদীসটির বাহ্যতঃ পরিপন্থী ছিল) বলুন তো, একদিকে কোরআনের পর বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারীর হাদীস, অপরদিকে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য। এখন কোন দিকে যাবো? জবাবে আমি বললাম, আপনার সামনে তো বুখারী শরীফের মাত্র একটি হাদীস রয়েছে, যার সঠিক ব্যাখ্য বুঝা কতটুকু সম্ভব হয়েছে আপনার পক্ষে সে আল্লাহ পাকই জানেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একই সাথে কোরআন হাদীসের অসংখ্য যুক্তিকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন কোরআন হাদীসের ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। সেই সাথে তিনি অন্যান্যদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম যুগের ছিলেন বলে তার পক্ষে 'সহীহ' সনদে অধিক পরিমাণে হাদীস সংগ্রহ করা এবং কোরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা পরবর্তী যুগের লোকদের তুলনায় বিশেষ করে আপনার আমার তুলনায় অধিক সম্ভব হয়েছিল। এবার বলুন তো, কার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অতঃপর তাকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ কোরআনের অন্য একটি আয়াতের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তার তাবীল তথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

মোটকথা, ফেকাহ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন হাদীস-গ্রন্থের কোন একটি বর্ণনা দেখে কোন মাসআলার সমাধান করাতে গোমরাহীর সম্ভাবনাই অধিক।

আর সেজন্যই আমাদের পূর্বসূরীগণ এ ব্যাপারে উম্মাহকে বিশেষভাবে সতর্ক করে গিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালেক (রঃ)র শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব আল মিস্‌রী এবং ইমাম আল লাইস ইবনে সায়াদ (রঃ) বলেনঃ

'হাদীস' একমাত্র ওলামা ছাড়া অন্যান্যদের জন্য (অনেক ক্ষেত্রে) ভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদ্রূপ ইবনে উয়াইনাহ বলেন-

ফুকাহা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য হাদীস (অনেক ক্ষেত্রে) ভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্বেই বলে এসেছি যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত বিষয়গুলো দু' ভাগে বিভক্তঃ সহজবোধ্য ও দুর্বোধ্য। আর এও বলে এসেছি যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোই হল ওলামাদের পরস্পরের মতপার্থক্যের কেন্দ্রস্থল। আর উপরোক্ত বক্তব্যগুলোতে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, স্বতঃসিদ্ধ ও সকল প্রকার জটিলতামুক্ত বিষয়গুলোতে ভ্রান্তির কোনই কারণ নেই; বরং যেসব বিষয়ে শব্দগত দিক থেকে অথবা আনুষঙ্গিক দিক থেকে অথবা অন্য কোন কারণে জটিলতা রয়েছে বা বিষয়টি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। অথবা, অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ সেসব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ফিকাহশাস্ত্রে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ব্যতীত সরাসরি মাসআলা ইস্তিম্বাত করতে গেলে গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, নিকাহে মুতআ'র প্রথমে অনুমতি ছিল। পরে রহিত হয়ে গিয়েছে, পুনরায় অনুমতি দেয়া হয়েছে, পুনরায় রহিত করা হয়েছে। এখন স্বভাবতঃই অনুমতির হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে কেউ যদি আমল করতে থাকে তবে গোমরাহিতে পড়বে নিঃসন্দেহে।

তবে এর অর্থ এও নয় যে, 'হাদীস শাস্ত্র যখন গোমরাহীর কারণ কাজেই, তার ধারেকাছে যাওয়া যাবে না; বরং এর অর্থ হল, ফিকাহ শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে এবং ইমামদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে সরাসরি হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে।

আর সে জন্যই ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন যে, আমরা একমাত্র ফুাকাহা ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করে থাকি না।

অনুরূপ, 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল-হাদীস' আবুয্-যিন্নাদ (আব্দুল্লাহ ইবেন যাক্‌ওয়ান) বলেন-

আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, আমরা শুধু ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও

বিশ্বস্তদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করে থাকি এবং যতটুকু গুরুত্ব কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে দিয়ে থাকি হাদীস শিক্ষার ব্যাপারেও তা দিয়ে থাকি।

খতীব বাগদাদী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার মুগিরাহ আল-যাবয়ি ইব্রাহীম আল-নাখায়ী (রঃ)র মজলিসে উপস্থিত হতে বিলম্ব করলেন, ইব্রাহীম তাকে বিলম্ব করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমাদের নিকট জনৈক হাদীস বর্ণনাকারী 'শায়েখ' এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করায় ব্যস্ত ছিলাম। ইমাম ইব্রাহীম বললেন-

তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখেছ, আমারা এমন লোকের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করি যার মধ্যে হালাল-হারামের পার্থক্য করার সামর্থ্য রয়েছে। তুমি অনেক মুহাদ্দিসকেই দেখবে যে, নিজের অজান্তেই তিনি হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল প্রতিপন্ন করে যাচ্ছেন।

ইমাম ইব্রাহীম আল-নাখায়ী (রঃ) বলেন-

কোন মতামত রেওয়ায়েত ব্যতিরেকে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপ, কোন রিওয়ায়েতও মতামত ব্যতিরেকে সাঠিক হতে পারে না।

ইমাম সারাখসী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শায়বানী (রঃ) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু সুলাইমান আল খাততাবী (রঃ) 'মা'আলেমুস্সুনানে লিখেছেনঃ

আজকের আলেম সম্প্রদায়কে দেখছি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। হাদীস ও 'আছর' পন্থী আর ফেকাহ ও কেয়াসপন্থী। আর উভয়টিই প্রয়োজনের বেলায় অপরিহার্য। মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছতে একে অপরের মুখাপেক্ষী। কেননা, হাদীসশাস্ত্র হল মূল ভিত্তিতুল্য আর ফিকাহশাস্ত্র হল সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত একটি ইমারততুল্য। আর বলাবাহুল্য যে, মূল ভিত্তি ছাড়া যেমন কোন ইমারত নির্মাণের কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ ইমারতবিহীন শুধু ভিত্তিরও কোন মূল্য নেই।

কোন 'সহী হাদীস' সংগ্রহ করার পর তার উপর আমল করার জন্য আমাদের পূর্বসূরীগণ আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতেন সেটা হল, অনুসরণীয় সাহাবা ও ইমামদের মধ্যে কেউ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন কি না। কেউ যদি এর উপর আমল না করে থাকেন তবে তা গ্রহণ করতেন না। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, কোন হাদীসকে মূল্যায়নের মানদণ্ড হল পূর্বসূরীদের আমল; পূর্বসূরীদের আমলের উপর নির্ভর করে হাদীস গ্রহণ করা-না করা। (নাউযুবিল্লাহ) কষ্মিনকালেও নয়; বরং এর অর্থ হল, হাদীসটির উপর একজনেরও যদি আমল না পওয়া যায় তবে বুঝা যাবে, হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে আমলযোগ্য নয়।। আর যে হাদীস সকলেই মূলতবী করেছেন নিশ্চয়ই তার বিপক্ষে অন্য কোন প্রবল যুক্তি রয়েছে, অথবা সেটি 'মনসূখ' বা রহিত। কাজেই তার উপর আমল করা যাবে না। আর পূর্বসূরীদের আমল তালাশ করা শুধু মাত্র এ কথা প্রমাণিত করার জন্য যে, হাদীসটি 'মনসূখ' নয় এবং অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণও নয়।

আল্লামা ইবনে আবু যায়েদ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

কোন মত বা কিয়াসের কারণে সুন্নাহর প্রতি আমল ব্যাহত হতে পারে না। আমাদের পূর্বসূরীগণ যেসব হাদীসের 'তাবীল' বা ব্যাখ্যা করেছেন, আমরাও তার ব্যাখ্যা করেছি। আর তাঁরা যেগুলোর উপর আমল করেছেন আমরাও আমল করেছি। তাঁরা যেগুলো মূলতবী করেছেন আমরাও সেগুলো মুলতবী রেখেছি। আর তাঁরা যেগুলো থেকে বিরত রয়েছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা আমাদের পক্ষেও সম্ভব। আর তাঁরা যেসব বিশ্লেষণ করেছেন সেগুলোর আমরা অনুসরণ করি। আর যেসব বিষয় তাঁরা ইস্তিম্বাত করেছেন এবং নবউদ্ভূত মাসআলার যে সমাধান পেশ করেছেন সেসব বিষয়ে তাদের মতানুসরণ করি। আর যে সব বিষয়ে বা ব্যাখ্যায় তাঁরা পরস্পরে মতপার্থক্য করেছেন সেগুলোতে তাঁদের জমাত থেকে বের হয়ে যাই না।

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রঃ) কে কোন এক সময় তার ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি অমুক হাদীসটির অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি কেন? জবাবে তিনি বললেন, (لم اجد الناس عليه) এ জন্য যে, পূর্বসূরীদের কাউকে এর অনুকূল আমল করতে দেখিনি।

ইমাম নাখায়ী বলেন-

অযুর মধ্যে টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে পাঠ করে থাকি। এতদসত্ত্বেও যদি সাহাবাদেরকে হাঁটু পর্যন্ত পা ধুতে দেখতাম তবে আমি তাদের অনুসরণে অবশ্যই হাঁটু পর্যন্ত ধৌত করতাম। এ জন্য যে, তাদের ব্যাপারে সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরক করার কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া তাঁরা ছিলেন (ارباب العلم) সত্যিকার ইল্‌মের অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক আগ্রহশীল। কাজেই, তাঁদের ব্যাপারে এহেন সংশয় সেই করতে পারে যে মূলত দ্বীনের ব্যাপারেই সংশয়ী।

ইবনে মুয়া'যযিল (রঃ) বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি ইবনে মাজেশূনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে নিজের রিওয়ায়েত করা হাদীসের উপর অনেক সময় নিজেই আমল করেন না, এর কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমরা এ হাদীসটি জেনে শুনেই বাদ দিয়েছি।

ইমাম মালেকের জনৈক শাগরিদ হাফেজে হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রবিদ মুহাম্মদ ইবেন ঈসা আত্‌তিবা' বলেন–

যদি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোন হাদীস পৌঁছে, যার উপর সাহাবাদের মধ্যে কেউ আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই তবে সে হাদীসটি তুমি ছেড়ে দিবে।

হাফেয ইবনে রাজাব আল হাম্বালী (রঃ) তাঁর রচিত 'ফায্‌লু ইলমিস্‌–সালাফ আ'লাল–খালাফ্ নামক কিতাবে লিখেন–

ফুকাহা ও ইমামগণ যে কোন সহী হাদীসের উপর আমল করতেন যদি সেটা সাহাবা, তাবেয়ীন অথবা, তাঁদের একটি জামায়া'তের নিকট আমলকৃত হত। কিন্তু যে হাদীসের তরক করার ব্যাপারে তাঁরা সকলে একমত ছিলেন তার উপর আমল করা জায়েয নেই। কেননা, সে হাদীসটি আমলের যোগ্য নয় বলে জেনে শুনেই তাঁরা ছেড়েছেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) বলেন, তোমরা সেসব মতামত গ্রহণ করবে যা তোমাদের পূর্বসূরীদের মতের অনুকূল হয়। কেননা, তাঁরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে রাজাব আরও বলেন–

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের পর যেসব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেসব ব্যাপারে লোকদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, তাঁদের পরে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর আহলে যাহেরদের এমন সব লোকেরা হাদীস বর্ণনা আরম্ভ করেছে যারা হাদীস ও সুন্নাহর অনুসারী বলে অভিহিত অথচ, পূর্বসূরী ইমামদের বোধ ও গ্রহণকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মতামত অবলম্বন করার ফলে সবচে' বেশী হাদীসের বিরোধিতা করেছেন।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম তাঁর রচিত ই'লামুল মুয়াক্‌ক্বি'য়ীন কিতাবে ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করেন–

যদি কোন ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মতপার্থক্য সম্বলিত কিতাবাদি থাকে তবে তার পক্ষে জায়েয হবে না যে, নিজ ইচ্ছা মুতাবেক কোন একটিকে মনোনীত করে আমল করবে বা ফয়সালা করবে; যতক্ষণ না কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেবে যে, তার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত আর কোনটি ছেড়ে দেয়া উচিত। তবেই তার পক্ষে সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

বয়স ও বংশ পরিচয়

তাঁর পূর্ণ নাম হল, আবু হানীফা আন–নু'মান ইবনে ছাবেত যাওতী। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৮০ হিজরীতে কূফা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষা দীক্ষাঃ

প্রথমতঃ তিনি কুফা শহরেই ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। অতঃপর কুফার শীর্ষস্থানীয় ফিকাহশাস্ত্রবিদ হাম্মাদ (রঃ) এর নিকট জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন। অতঃপর ১২০ হিজরীতে স্বীয় উস্তাদ হযরত হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং কুফার 'মাদাসাতুর রায়' এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সাথে ইরাকের অনন্য ইমাম বলে বিবেচিত হন এবং অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন এবং বসরাহ, মক্কা, মদীনা ও বাগদাদের তদানিন্তন সকল প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয়

ওলামা কেরামের সাথে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন এবং একে অপর থেকে উপকৃত হতে থাকেন। এভাবেই ক্রমশঃ তার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাসআলা ইস্তিম্বাতে ইমাম সাহেবের তীক্ষ্ণতাঃ

ইমাম সাহেব যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন তেমনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

একদিন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ক্বিরাত ও হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ তাবেয়ী' হযরত আ'মাশের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় কোন একটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করা হল। জবাবে তিনি তাঁর মতামত জানালেন। হযরত আ'মাশ (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দলিল তুমি কোথায় পেয়েছো। জবাবে ইমাম সাহেব বললেন যে, আপনিই তো আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন। আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে, আর ওয়ায়েল ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সূত্রে, আবী ইয়াস ও আবী মাসউদ আল আনসারীর সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ عَمَلِهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজে অন্যকে পথ দেখাবে (উদ্বুদ্ধ করবে) সে ব্যক্তি উক্ত নেক কাজটি করার সমতুল্য সওয়াবের অধিকারী হবে।

আপনি আরো বর্ণনা করেছেন আবী সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে যে, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার ঘরে নামায আদায় করছিলাম এমন সময় কোন এক ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে; ফলে আমার অন্তরে 'উজব' (আত্মতুষ্টি) সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ

তুমি দু'টি সওয়াব পাবে অপ্রকাশ্যে আমল করার এবং প্রকাশ্যে আমল করার।

এভাবে ইমাম সাহেব তারই বর্ণনাকৃত আরও চারটি হাদীস শুনালেন। ইমাম আ'মাশ বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর শুনাতে হবে না। আমি তোমাকে

একশত দিনে যা শুনিয়েছি তুমি এক ঘন্টায় তা শুনিয়ে দিলে। আমার ধারণাও ছিল না যে, তুমি এ হাদীসগুলোর উপর আমল করে থাকো। সত্যি তোমরা ফকীহরা হলে ডাক্তারতুল্য; আর আমরা হলাম ওষুধের দোকানদার। আর তুমি তো উভয় দিকই হাসিল করেছ।

(الجواهر المضية ২য় খণ্ড, ৪৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, একদিন আমি সিরিয়াতে হযরত আওযায়ী'র নিকট এলাম। তিনি আমাকে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুফা শহরে যে একজন বিদ'আতীর আবির্ভাব ঘটেছে, কে সে? আমি (তখনকার মত কোন জবাব না দিয়ে) ঘরে ফিরে এসে ইমাম সাহেবের কিতাবগুলো ঘেটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের করলাম এবং তিনদিন পর কিতাবটি হাতে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি কিতাব? আমি কিতাবটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি কিতাবটি হাতে নিতেই এমন একটি মাসআলার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল যাতে আমি (قال النعمان) শব্দটি চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি আযানের পর থেকে নামাজের ইকামত পর্যন্ত কিতাবটির সিংহভাগ পড়ে ফেললেন। অতঃপর কিতাবটি বন্ধ করে তিনি নামায পড়ালেন। সেই মসজিদের তিনি ইমাম ও মুয়ায্যিন ছিলেন। নামাজের পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নু'মান ইবনে ছাবেত লোকটি কে? আমি বললাম, তিনি একজন 'শায়খ'। ইরাকে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এ লোকটি শীর্ষস্থানীয় শায়খ। তার নিকট গিয়ে আরও অধিক পরিমাণ জ্ঞান আহরণ কর।' আমি বললাম, ইনি তো সেই ব্যক্তি যার নিকট যেতে আপনি বারণ করেছিলেন।

(তারীখে বাগদাদ ১৩ তম খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)

অতঃপর যখন মক্কা শরীফে ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি ইমাম সাহেবের সাথে সেসব মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ইবনুল মুবারক তাঁর কাছ থেকে যতটুকু লিখেছিলেন তিনি তার চেয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। সেই মজলিস থেকে ফিরে ইমাম আওযায়ী ইবনুল মুবারককে বললেন, লোকটির অসাধারণ ইলম এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আর আমি আল্লাহ পাকের দরবারে ইস্তিগফার

করছি। কেননা, আমি প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ কর। তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য ইতিপূর্বে আমার কাছে পৌঁছেছিল তিনি তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। (আওজাযুল মাসালেক ১খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তার শাগরিদদেরকে যারা পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে শির্ষস্থানীয় হাফেযে হাদীস ফাযল ইবনে মূসা আস্‌সিনানীকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যারা অপবাদ গেয়ে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তিনি বললেন, আসল ব্যাপার হল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাদের সামনে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করেছেন যার সবটা তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর তিনি তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। ফলে তারা ইমাম সাহেবের সাথে হিংসা আরম্ভ করেছেন।

একদিন দারুল হানাতীনে ইমাম আবু হানীফা ও আ ওযায়ী (রঃ) একত্রিত হয়ে ইল্‌মী আলোচনা করতে থাকলেন। ইমাম আওযায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা 'রুকু'র সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন? ইমাম সাহেব বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে। ইমাম আওযায়ী বললেন, কেন? আমাদেরকে ইমাম যুহরী, সালেম থেকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আরম্ভ করতে, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে হাত উঠাতেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বললেন, আমাকে হাম্মাদ ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামাজ আরম্ভ করার সময় ব্যতীত আর কোন সময় হাত উঠাতেন না। ইমাম আওযায়ী বললেন, আমি তোমাকে যুহরী, সালেম ও ইবনে ওমরের (রাঃ) বরাতে হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি শুনাচ্ছ হাম্মাদ আর ইব্রাহীম থেকে। জবাবে ইমাম আবু হানীফা বললেন, আমার বর্ণিত হাদীসের 'সনদে' হাম্মাদ তোমার সনদের যুহরীর তুলনায় অধিক ফকীহ ছিলেন। আর ইবনে ওমর যদিও সাহাবী, কিন্তু আলকামা তার চেয়ে কম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। আর আসওয়াদের অনেক ফযীলত রয়েছে।[১] অতঃপর ইমাম আওযায়ী নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

১। পূর্বেই আমরা বলে এসেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর ফকীহ হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এর কারণও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার অসাধারণ ব্যুৎপত্তিঃ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ফিকাহশাস্ত্রে এবং মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অনুরূপ, হাদীসশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যেমন একটু পূর্বেই আমরা ইমাম আ'মাশের মন্তব্য শুনে এলাম যে, 'তুমি উভয় দিকই হাসিল করেছ।' বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি কোরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত ফিকাহর ইমাম হতে পারে না। কেননা, ফিকাহশাস্ত্র কোরআন হাদীস থেকেই উৎসারিত। কাজেই ইমাম আবু হানীফার মত ফিকাহশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তির সম্পর্কে এ কথা ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন; বরং অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রেও অতুলনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি চার হাজার শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন বলে বিভিন্ন লেখক মন্তব্য করেছেন।[১]

১। আস সুন্নাহ ৪১৩ পৃঃ, উকুদুল জাম্মান ৬৩ পৃষ্ঠা। খাইরাতুল হিসান ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ আস্‌সালেহী 'উকুদুল জাম্মান' গ্রন্থে দীর্ঘ ২৪ পৃষ্ঠায় ইমাম সাহেবের মাশায়েখদের একটা ফিরিস্তি পেশ করেছেন।। (উকুদুল জাম্মান-৬৩-৮৭ পৃঃ।

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) বর্ণনা করেন,

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। 'সহীহ' হাদীস সম্পর্কে তিনি আমার চেয়ে অধিক দূরদর্শী ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) আরও বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যখন দৃঢ়তার সাথে কোন মন্তব্য পেশ করতেন, তখন তাঁর এ মন্তব্যের সপক্ষে হাদীস বা 'আছর' সংগ্রহ করার জন্য কূফা শহরের সকল 'মাশায়েখ'দের কাছে যেতাম।

অনেক সময় এর সপক্ষে দু' তিনটি হাদীস পেয়ে যেতাম। অতঃপর সেগুলো ইমাম সাহেবের নিকট পেশ করলে তিনি এর মধ্যে অনেকগুলো সম্পর্কে এও বলতেন যে, এই হাদীসটি 'সহীহ' নয় অথবা অপরিচিত (সূত্রে বর্ণিত)। আমি তাকে বলতাম, তবে এ সম্পর্কে আপনার কি জানা রয়েছে। অথচ, এ হাদীসটি তো আপনার বক্তব্যের অনুকূল। জবাবে তিনি বলতেন, আমি কুফাবাসীদের ইল্‌ম সম্পর্কে ভালভাবেই জানি।

এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ইমাম সাহেব হাদীস শাস্ত্রে কি পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ সারা শহর ঘুরে যা সংগ্রহ করতেন তার চেয়ে বেশী তাঁর কাছে আগে থেকেই রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কুফা শহরের ওলামাদের সংগৃহীত সকল ইল্‌ম সংগ্রহ করেছিলেন। যেমন ইমাম বুখারীর জনৈক উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে আদম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) নিজ শহরের সকল হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের হাদীসগুলোর প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, বিভিন্নমুখী হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বশেষ হাদীস কোনটি ছিল) যার দ্বারা অন্যান্যগুলো রহিত সাব্যস্ত করা সহজ হয়।

বিখ্যাত ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও আবেদ হাসান ইবনে সালেহ বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হাদীসের নাসেখ–মানসূখ নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। কাজেই তিনি কোন হাদীসের উপর তখনই আমল করতেন যখন সে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সেই সাথে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রমাণিত হত। (কেননা, পূর্বেই বলে এসেছি যে, সাহাবাদের আমল দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, হুযুরের সর্বশেষ আমল কোনটি ছিল এবং কোনটি 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে)। আর তিনি কুফাবাসী (ওলামায়ে কেরামের) হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তার নিজ শহরের (ওলামাদের) আমল কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। ইবনে সালেহ আরও বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (নিজেই) বলতেন, কোরআনের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যা 'নাসেখ' (অন্য নির্দেশকে রহিতকারী) আর কিছু বিষয় রয়েছে 'মানসূখ'। অনুরূপ, হাদীসের মধ্যে কিছু 'নাসেখ' ও কিছু 'মানসূখ' রয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা তাঁর শহরে যেসব হাদীস পৌছেছে তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সময়কার সর্বশেষ আমল কি ছিল সেসব তাঁর মুখস্থ ছিল।

মোটকথা, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কুফা শহরের ওলামাদের হাসিলকৃত সকল ইল্‌ম সংগ্রহ করেছিলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি কুফা শহর থেকে সফর করে দীর্ঘ ছয়টি বছর মক্কা মদীনা অবস্থান করে সেখানকার সকল 'শায়েখে'র নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। আর মক্কা মদীনা যেহেতু স্থানীয় ও বহিরাগত সকল ওলামা, মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের কেন্দ্রস্থল ছিল। কাজেই এক কথায় বলা চলে যে, মক্কা মদীনা ছিলো ইলমের 'মারকায'। আর তাঁর মত অসাধারণ ধী–শক্তি সম্পন্ন, কর্মঠ ও মুজতাহিদ ইমামের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ মক্কা মদীনার ইলম হাসিল করা নিঃসন্দেহে সাধারণ ব্যাপার নয়।

এ ছাড়া তিনি পঞ্চান্ন বার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (উকূদুল জাম্মান ২২০ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) প্রত্যেক সফরেই তিনি মক্কা মদীনার স্থানীয় ও বহিরাগত ওলামা, মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসীনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

আল্লামা আলী আল কারী মুহাম্মদ ইবনে সামায়াহ'র বরাত দিয়ে বলেছেন, আবু হানীফা (রঃ) তার রচিত গ্রন্থগুলোতে সত্তর হাজারের উর্ধ্বে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর الآثار গ্রন্থটি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে লিখেছেন। (আল–জাওয়াহিরুল মুযীআহ ২ খঃ, ৪৭৪ পৃঃ)

ইয়াহইয়া ইবনে নসর বলেন, একদিন আমি ইমাম আবু হানীফার ঘরে প্রবেশ করি, যা কিতাবে ভরপুর ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কি? তিনি বললেন, এগুলো সব হাদীসের কিতাব' এর মধ্যে সামান্য কিছুই আমি বর্ণনা করেছি, যেগুলো ফলপ্রদ। (আস্ সুন্নাহ ৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য, উকূদু জাওয়াহিরিল মুনীফাহ, ১ঃ ৩১)

ইমাম আবু হানীফাহ (রঃ)র যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মত হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন মজলিস ছিল না এবং হাদীসশাস্ত্রে কোন কিতাব সংকলন করেননি। যেমন, ইমাম মালেক (রঃ) করেছেন। কিন্তু তাঁর শাগরিদগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো সংগ্রহ করে বিভিন্ন কিতাব ও 'মুসনাদ' সংকলন করেছেন যার সংখ্যা দশের উর্ধ্বে।

তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হল, ইমাম আবু ইউসুফ রচিত 'কিতাবুল আ'সার'। ইমাম মুহাম্মদ রচিত 'কিতাবুল আ'সার আল মারফুয়াহ ও আল আসারুল মারফুয়াহ ওয়াল মাওকুফাহ। মুসনাদুল হাসান ইবনে যিয়াদ আল লু'লুয়ী। মুসনাদে হাম্মাদ ইবনে ইমাম আবু হানীফা। ইত্যাদি।

অনুরূপ, আল-ওয়াহাবী, আল-হারেসী আল-বুখারী, ইবনুল মুযাফ্ফার, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল 'আদল, আবু নায়ী'ম আল ইস্পাহানী, কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকী আল আনসারী, ইবনে আবীল-আউয়াম আস্সাদী ও ইবনে খস্রু আল-বালাখীও ইমাম সাহেবের হাদীস সংগ্রহে বিভিন্ন মুসনাদ রচনা করেছেন।

অতঃপর প্রধান বিচারপতি আবুল মুআইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল খাওয়ারিযিমী (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরী) উপরোক্ত মুসনাদগুলোর অধিকাংশকে একত্রিত করে জামেউল মাসানীদ নামে ফিকাহশাস্ত্রের অধ্যায়ের ধারাবহিকতায় الاسناد مع حذف معاد وعدم تكرار মহা 'মুসনাদ গ্রন্থ' রচনা করেছেন। তাঁর ভূমিকাতে তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে অনেকের মুখেই শুনেছি যারা ইমাম আবু হানীফার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা মুসনাদে শাফেয়ী, মুআত্তা মালেকের সাথে তুলনা করে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে, তিনি হাদীস সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তাদের ধারণা যে, ইমাম আবু হানীফার কোন 'মুসনাদ' নেই এবং তিনি সামান্য কিছু ছাড়া হাদীস রিওয়ায়েত করেননি। কাজেই আমি দ্বীনের মর্যাদাবোধের লক্ষ্যে ১৫টি মুসনাদকে একত্রিত করার প্রয়াস পেলাম যা ইমাম আবু হানীফার নিকট হতে হাদীসশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম সংকলন করেছেন। তাঁর এ কিতাবটি আটশত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

এছাড়াও অসংখ্য প্রমাণ ও ঘটনা রয়েছে যা ইমাম সাহেবের অসাধারণ জ্ঞানের এবং হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে তদানিন্তন অনন্য মর্যদার সাক্ষ্য বহন করে। ইমাম সাহেবের জীবনী লেখা যেহেতু আমার উদ্দেশ্য নয় বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা লিখলাম। তার সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী থানুভী (রঃ) রচিত "ইনজাউল ওয়াত্বান আনিল ওয়াদাই বি-ইমামিয্ যামান"। আল্লামা সালেহী আল শাফেয়ী (রঃ) রচিত "উক্কুদুল হামান"। আল মুওয়াফফিক আল মাক্কী রচিত "মানাকিবু আবি হানিফাতা" মুহাম্মদ যাহেদ আল কাওসারী রচিত "নাইবুল খাত্বীব"। আলী আল-ক্বারী রচিত "মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফাতা"। দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষায়ও তার জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন বই রয়েছে।

শেষ কথা

যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিতর্কিত ও জটিল একটি বিষয় নিয়ে কোরআন-সুন্নাহ, সাহাবাদের বাণী ও আমল এবং পূর্বসূরী আকাবিরদের রচিত কিতাবাদির আলোকে সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। আশাকরি এ আলোচনা দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

(এক) ফিকাহশাস্ত্র নতুন কোন বিষয় নয়; বরং কোরআন ও হাদীস থেকেই উৎসারিত ফলাফল মাত্র। কাজেই ইমাম আবু হানীফা বা অন্যান্য ইমামদের সংকলিত ফিকাহশাস্ত্রের অনুসরণ করা বস্তুতঃ কোরআন ও হাদীসেরই অনুসরণ করা।

(দুই) সেই সাথে ফিকাহশাস্ত্র সংকলনের বেলায় ফুকাহা ও ইমামদের মাঝে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে তা কোন মতেই নিন্দনীয় নয়। বরং উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ এবং এতে তাঁরা অপারগও বটে। কেননা, তাদের এ মতপার্থক্য কোন প্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা হিংসাপ্রসূত ছিল না বরং প্রত্যেকেরই নিজ সাধ্যানুযায়ী কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইখলাসের সাথে মাসআলা ইস্তিম্বাত করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

(তিন) ফিকাহর এ মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বসূরী ফুকাহায়ে কেরামদের পরস্পরে কখনও অশ্রদ্ধাবোধ বা দ্বন্দ্ব কলহ পরিলক্ষিত হয়নি।

কাজেই তাদের মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আমাদের পরস্পরে কলহ বিবাদ সৃষ্টি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(চার) ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ কল্পনাতীত পরিশ্রম ও জীবনপণ সাধনা করে কোরআন ও হাদীসের সংগৃহীত সকল যুক্তি ও দলিলকে সামনে রেখে ফিকাহ শাস্ত্র সংকলন করেছেন। যার সামান্য একটু চিত্র এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা অনেকটা ভেসে উঠেছে। কাজেই কোন কিতাবের দু' একটি হাদীস বা কোরআনের দু' একটি আয়াতের তরজমা দেখে তাদের এ অকল্পনীয় সাধনাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা অনধিকার চর্চা বৈ কিছু নয়।

(পাঁচ) এ কথাও প্রমাণ করে এসেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) পরবর্তী যুগের ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসদের অপেক্ষা হাদীসশাস্ত্রে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ ছিলেন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রণেতা বা অনুসারী। (মায়ারেফুস্ সুনান–৬খঃ, ৬১৩–৬১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কাজেই তাঁদের রচিত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত দু' একটি হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের বা অন্য কোন মাযহাবের কোন ফতোয়াকে মূল্যায়ন করা মোটেই সংগত নয়। তাই বলে (নাউযুবিল্লা) আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, আমি পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী শরীফকে বা মুসলিম শরীফকে অশ্রদ্ধা করছি। বরং এ যাবৎ আমার দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা অনায়াসেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বুখারী শরীফে বা অন্য কোন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত যে হাদীসটি পাঠকের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যের পরিপন্থী বলে মনে হচ্ছে, হতে পারে হানাফী ইমামদের নিকট সে হাদীসটি 'মানুসূখ' প্রমাণিত হয়েছে, অথবা অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ বলে তাঁরা সেটাকে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অনুরূপ, এও সম্ভব যে, তাঁরা যেসব বিশুদ্ধ ও প্রবল দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা পেশ করেছেন সেগুলো উল্লেখিত মুহাদ্দিসদের নিকট আদৌ পৌছেনি, অথবা দুর্বল সূত্রে পৌছেছে যার কারণে সে সব হাদীস তাদের গ্রন্থগুলোতে স্থান পায়নি। কাজেই কোন হাদীস বুখারী মুসলিমে নেই বলেই তো সেটাকে দুর্বল বা 'মওযু' বলে আখ্যা দেয়া যায় না।

এবার পরিশেষে আরজ করব, আমরা বিতর্কের মনোভাব না নিয়ে

স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। সেই সাথে আমাদের পূর্বসূরী ইমামদের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হতে চেষ্টা করি। তাঁদের অনন্য ইহ্সানের কথা ভুলে না গিয়ে তাঁদের ইহ্সানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

আরও আরজ করব, বিষয়টি যেহেতু অনেকটা বিতর্কিত ও জটিল কাজেই আমার লেখনীতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা সুধী পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে অথবা আপত্তিকর কোন বিষয় পরিলক্ষিত হলে বা কোন প্রকার প্রশ্ন থাকলে সরাসরি আমাকে জানিয়ে দিলে বাধিত হব। প্রয়োজনবোধে পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

গ্রন্থ পঞ্জী

পুস্তিকাটি রচনাকালে যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

١- القرآن الكريم
٢- ترجمة القرآن : حكيم الأمة أشرف على تهانوى رح
٣- تفسير القرآن العظيم : حافظ عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - المتوفى - ٧٧٤ هـ
٤- تفسير الفخر الرازى : (المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب) الإمام محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر (٥٤٤ - ٦٠٤)
• دار الفكر، بيروت، لبنان
٥- الجامع لأحكام القرآن الكريم : للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى (المتوفى ٦٧١ هـ / ١٢٧٣م) دار إحياء التراث، بيروت.
٦- تفسير أبى السعود : المسمى ب: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لقاضى القضاة الإمام أبى السعود محمد بن محمد العمادى المتوفى هـ. دار إحياء التراث العربى بيروت، لبنان
٧- فتح القدير : محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى - ١٢٥٠ هـ
٨- مختصر تفسير الطبرى : لإمام المفسرين أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المسمى ب: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، اختصار وتحقيق : الشيخ محمد على الصابونى، والدكتور صالح أحمد رضا، دار التراث العربى.
٩ تفسير معارف القرآن، مفتى محمد شفيع رحمة الله عليه.
١٠ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخارى) للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعفى، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ
١١ صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج
١٢ سنن أبى داؤد، أبو داؤد سليمان بن الأشعث السجستانى
١٣ سنن الترمذى،
١٤ سنن الدارمى، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى. (٢٥٥ هـ)
١٥ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (٩١١ هـ)
١٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ)
١٧ مسند الحميدى،
١٨ مصنف عبد الرزاق
١٩ مصنف بن أبى شيبة
٢٠ مسند الإمام الشافعى، الإمام محمد بن إدريس الشافعى
٢١ رياض الصالحين، الإمام أبى زكريا يحى بن شرف النووى الدمشقى، ٦٣١-٦٧٦ هـ
٢٢ صحيح ابن خزيمة، المكتبة الإسلامى، (الطبعة الأولى - ١٣٩٥ هـ)
٢٣ سنن النسائى، أحمد بن شعيب النسائى
٢٤ المراسيل، الإمام أبو داؤد سليمان السجستانى المتوفى ٢٩٥ هـ، (الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ)
٢٥ فتح البارى شرح صحيح البخارى، أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى.
٢٦ فيض القدير للمناوى
٢٧ أجز المسالك، شيخ الحديث زكريا رحمة الله المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة
٢٨ المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج، الإمام يحى بن شرف النووى.
٢٩ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
٣٠ حاشية السندى على النسائى
٣١ مشكل الآثار
٣٢ شرح معانى الآثار، أبو جعفر أحمد محمد بن سلمة الطحاوى - ٢٢٩-٣٢١ هـ، دار الكتب العلمية (الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ)
٣٣ اختلاف الحديث، الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمة الله، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت (الطبعة الأولى)
٣٤ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى، دار المعارف، بيروت
٣٥ الجرح والتعديل، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى، المتوفى - ٣٢٧ هـ، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان
٣٦ تهذيب الأسماء واللغات، الإمام يحى بن شرف النووى، إدارة الطباعة المنيرة
٣٧ تهذيب الآثار.
٣٨ زاد المعاد فى هدى خير العباد، الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى، المشهور ب: ابن القيم الجوزية، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية
٣٩ السنة ومكانتها
٤٠ فتح المغيث شرح ألفية الحديث، الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى ٩٠٢ هـ) دار الكتب العلمية
٤١ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (٨٤٩ - ٩١١ هـ)
٤٢ ما تمس إليه حاجة القارى لصحيح الإمام البخارى، الإمام يحى بن شرف النووى، دار الفكر عمان
٤٣ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ، الإمام حافظ أبو بكر محمد بن موسى (المتوفى - ٥٨٤) دار الطباعة المنيرة (الطبعة الأولى)
٤٤ عقود الجواهر المنيفة، الإمام سيد محمد مرتضى الزبيدى، مكتبة الرخصى بالأزهر
٤٥ الهداية شرح بداية المبتدى، على بن بكر المرغينانى (٥٩٣ هـ)
٤٦ در المختار شرح تنوير الأبصار، للتمرتاشى محمد بن على الحصكفى
٤٧ رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين محمد أمين
٤٨ نصب الراية الإمام جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى دار الحديث
٤٩ العناية فى شرح الهداية
٥٠ كتاب المغنى والشرح الكبير
٥١ مجموع فتوى ابن تيمة، تقى الدين أحمد بن تيمة (٦٣٠ هـ)
٥٢ المجموع شرح المذهب محى الدين يحى بن شرف الدين النووى (٦٧٦ هـ)
٥٣ إحياء علوم الدين، الإمام أبو حامد محمد الغزالى، المتوفى : ٥٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان (الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ)
٥٤ الإحكام فى أصول الأحكام، لأبى محمد على بن أحمد بن سعد بن أبى حزم الظاهرى دار الكتب العلمية بيروت، لبنان (الطبعة الأولى - ١٤٠٥ هـ)
٥٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لحافظ أبو نعيم بن عبد الله الإصفهانى، دار الكتب العربى (الطبعة الرابعة.)
٥٦ مناقب الإمام الشافعى، الإمام فخر الدين الرازى (المتوفى ٦٠٦ هـ)
٥٧ مناقب الشافعى، الإمام أبو بكر أحمد بن إسماعيل البيهقى (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ)
٥٨ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، حافظ أبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى
٥٩ حياة الصحابة، الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى دار القلم، دمشق،
٦٠ آداب الشافعى ومناقبه عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٦١ كشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد
٦٢ تاريخ بغداد للخطيب، دار الكتب العربى، بيروت
٦٣ معجم الأدباء، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى (شهاب الدين، دار المستشرقين
٦٤ عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان
٦٥ حجة الله البالغة، شاه ولى الله المحدث الدهلوى رحمة الله عليه.
٦٦ أثر الحديث الشريف فى اختلاف الفقهاء، محمد العوامة، دار السلام، بيروت
٦٧ رفع الملام عن الائمة الأعلام، تقى الدين أحمد بن تيمية
٦٨ الإنصاف فى سبب الاختلاف، شاه ولى الله المحدث الدهلوى رح
٦٩ دراسات فى اختلافات الفقهية، دكتور محمد أبو الفتح البيانونى مكتبة الهدى.
٧٠ جامع بيان العلم وفضله، للعلامة ابن عبد البر
٧١ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعى رح مكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
٧٢ المعجم الوسيط
٧٣ تقليد كى شرعى حيثيت، مولانا تقى عثمانى
٧٤ فضائل نماز، شيخ الحديث مولانا زكريا رح
٧٥ فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب الحنبلى
٧٦ إعلام الموقعين، ابن القيم الجوزية
٧٧ الفقيه والمتفقه، أبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى
٧٨ كتاب الجامع، لأبى محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى، المتوفى : ٢٨٦، مؤسسة الرسالة (الطبعة الثانية.)